দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

জগৎকল্যাণে ক্রিয়াযোগ
— পৃঃ ২৬

নির্বাচনে জেতা মানেই কলঙ্কমুক্ত হওয়া নয়
— পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা।। ২৪ জুন, ২০২৪।। ৯ আষাঢ়, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

ভারতীয় যোগের বিশ্বায়ন

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ৯ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৪ জুন - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,
Website : www.eswastika.com

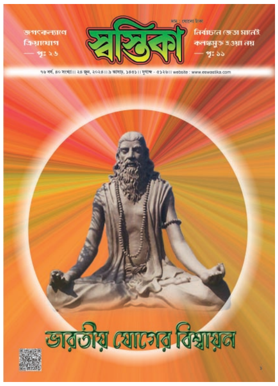

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা
সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল
প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩
দাম : ১৬ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024
R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

মমতাকে উপহার ১৪ আসন। এক গাছে দুটি ফুল সিপিএম-তৃণমূল 'ভস্মাসুর' ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

বিপর্যয়ের মধ্যেও জয় বিজেপির ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

গণতন্ত্রের চাটুতে সেঁকা একটি রাজনৈতিক রুটি ◻ অতনু বিশ্বাস ◻ ৮

ভারত-মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বৈঠকে প্রতিরক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিয়ে আলোচনা ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

নির্বাচনে জেতা মানেই কলঙ্কমুক্ত হওয়া নয় ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১১

আগামীতে আমাদের কিছু কঠিন সত্য নিয়ে সজাগ থাকা প্রয়োজন ◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ১৪

সরসরঙ্ঘচালকজীর বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে সবাইকে ভাবতে হবে ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১৭

হিন্দুদের জমি জবরদখলে বাংলাদেশ সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন ◻ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ১৮

বিযুক্তির নঞর্থকতাই রোগ, সদর্থক সংযুক্তির নাম যোগ ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ২৩

যোগগুরু যাঁরা যোগের বিশ্বায়ন ঘটিয়েছেন ◻ অর্পিতা দাস ◻ ২৪

আত্মানং বৈ বিজানথ ◻ অজয় ভট্টাচার্য ◻ ২৫

জগৎ কল্যাণে ক্রিয়াযোগ ◻ শুভেন্দু সরকার ◻ ২৬

ভারতীয় সংস্কৃতিতে যোগের ভূমিকা ◻ বিদিশা মৌলিক ◻ ২৮

অম্বুবাচী : নববর্ষা বরণ ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

রাম-রাজ্যের ধারণা ◻ ড. অনিল কুমার ঘোষ ◻ ৩৩

গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও গাজীপুরে ভয় দেখিয়ে হিন্দুদের জমি দখল করছে পুলিশের আইজি বেনজির ◻ ৩৫

চীন দেশে চু-চেন্-তাং-এর শুভ জন্মদিন পালন ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৪৩

ভারতবর্ষ—গ্রিক আক্রমণের পরে ◻ অমলেশ মিশ্র ◻ ৪৪

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৫০

প্রকাশিত হবে ১ জুলাই, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১ জুলাই, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মরণ

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীরে আত্মবলিদানের পর তাঁর জন্ম দিনটিকে কেন্দ্র করে স্বস্তিকা পত্রিকা প্রতিবছর সেই মহান জীবনের বিভিন্ন দিক সংবলিত মননশীল লেখা প্রকাশ করে চলেছে। প্রতি বছরের মতো এবারও তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিশ্ব যোগ দিবস

একদা ভারতবর্ষ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পে-সাহিত্যে, অর্থনীতিতে বিশ্বে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। বিশ্ববাসী তখন ভারতবর্ষকে গুরু হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। বিখ্যাত আমেরিকান মনীষী মার্ক টোয়েন বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ হইল মানবজাতির অগ্রগতির কেন্দ্রভূমি, শিক্ষার সূতিকাগার, ইতিহাসের জননী, কিংবদন্তীর মাতামহী এবং সভ্যতার প্রমাতামহী-স্বরূপা। ভারতবর্ষেই কেবল মানবজাতির সকল মূল্যবান ও শিক্ষণীয় বিষয়ের সূত্রসমূহ গচ্ছিত রহিয়াছে। শুধু মার্ক টোয়েন নহে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মনীষী এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। বস্তুত, ভারতবর্ষ কোনোদিন শুধুমাত্র নিজেকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকে নাই। অধীত জ্ঞান-বিজ্ঞান অকাতরে সমগ্র বিশ্বকে দান করিয়াছে। ভারতবর্ষের ঋষি বলিয়াছেন, ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি। তাঁহারা বিশ্ববাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছেন, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। তাঁহারা শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, যানি অনবদ্যানি কর্মানি তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি— যাহা শ্রেষ্ঠ কর্ম তাহাই সম্পাদন করো, খারাপ কিছু নহে। ভারতবর্ষ শুধু আপনাকে পরিবার মনে করে নাই, মনে প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছে, বসুধৈব কুটুম্বকম্— সমগ্র বিশ্ব এক পরিবার। তাই ভারতবর্ষ যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা আয়ত্ত করিয়াছে এবং জগৎ কল্যাণে বিশ্বকে তাহা দানও করিয়াছে। জগতের পক্ষে কল্যাণকর অনেক কিছুর সহিত ভারতবর্ষ যোগবিজ্ঞানও বিশ্বকে দান করিয়াছে। সভ্যতার উষালগ্নে ভারতীয় ঋষিগণ এই যোগবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছেন। বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদে যোগের উল্লেখ রহিয়াছে। সংস্কৃত যুজ্ ধাতু হইতে ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহার অর্থ হইল সংযুক্ত করা, মিলন সাধন করা। যোগের মাধ্যমে শরীর, মন সংযত করিয়া অন্তরাত্মার সহিত মিলন, বিশ্বাত্মার সহিত মিলন, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মিলন। জগৎ কল্যাণে নিজেকে উপযোগী করিবার জন্যই ভারতীয় ঋষিগণ যোগ প্রক্রিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন। ভারতবাসীর নিত্যপাঠ্য গীতাগ্রন্থে যোগ, যোগী ও যোগেশ্বর শব্দ বারবার উচ্চারিত হইয়াছে। সমগ্র গীতাগ্রন্থটি একটি যোগগ্রন্থ। তাহার অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রতিটির এক-একটি যোগ হিসাবে বর্ণিত করিয়াছেন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ।

গীতাগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তিনি এই অবিনাশী যোগ সূর্যকে বলিয়াছিলেন। সূর্য তাঁহা পুত্র বৈবস্বত মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু তাঁহার পুত্র রাজা ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। এইভাবে পরম্পরা রূপে প্রাপ্ত যোগ রাজর্ষিগণ জানিয়াছিলেন। তাহার পর দীর্ঘকাল এই যোগ ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেই লুপ্ত যোগকে পুনরুদ্ধার করিয়াছেন মহর্ষি পতঞ্জলি। তাঁহাকেই আধুনিক যোগের জনক বলা হইয়া থাকে। তিনি মানবজাতিকে যম নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান ও সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগের সূত্র প্রদান করিয়াছেন। এই আটটি ক্রম আয়ত্ত করিতে পারিলেই মানুষ আত্মানং বিদ্ধি অর্থাৎ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আর স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেই মানুষের বোধ জন্মাইবে, সকলের মধ্যে একই আত্মা বিদ্যমান। তাহা হইলেই মানুষে মানুষে ভেদ ঘুচিয়া একাত্মতা নির্মাণ হইবে। তাহাতেই সমগ্র বিশ্ব এক পরিবার বোধ জাগ্রত হইবে এবং বিশ্বের যাবতীয় হিংসার অবসান ঘটিবে।

যোগের অন্তর্নিহিত ভাবটি অনুধাবন করিয়াই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভাষণে বিশ্ববাসীর জন্য যোগ দিবসের প্রস্তাব রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রস্তাবে বিশ্বের ১৭৭টি দেশ সমর্থন জানাইয়াছিল। সেইমতো ২০১৫ সাল হইতে ২১ জুন তারিখটিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে ঘোষণা করিয়াছে। সমগ্র বিশ্বে এই দিনটি মহা উৎসাহে পালিত হইতেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে প্রতি বৎসর যোগ দিবসের একটি থিম রাখা হইয়া থাকে । প্রথম থিম ছিল 'সম্প্রীতি ও শান্তির জন্য যোগ'। ২০২৪ সালের থিম রহিয়াছে 'নারীজাতির ক্ষমতায়নে যোগ'। সকলেই স্বীকার করিতেছেন, মহোপনিষদের বাণী বসুধৈব কুটুম্বকমের ভাবটি আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভের পথে চলিয়াছে এবং ইহার হোতা হিসাবে অবশ্যই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিশ্ববাসী চিরকাল মনে রাখিবে।

সুভাষিতম্

ব্যায়ামাৎ লভতে স্বাস্থ্যং দীর্ঘায়ুষ্যং বলং সুখং।
আরোগ্যং পরমং ভাগ্যং স্বাস্থ্যং সর্বার্থসাধনম্।।

ব্যায়ামের দ্বারা স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, বল ও সুখ লাভ করা যায়। নীরোগ থাকা পরম ভাগ্যের বিষয় আর সুস্বাস্থ্যের দ্বারা সমস্ত কাজ সিদ্ধ হয়।

মমতাকে উপহার ১৪ আসন

এক গাছে দুটি ফুল সিপিএম-তৃণমূল ‘ভস্মাসুর’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

২০১৯-এর লোকসভা ভোটে ‘৪২-এ-৪২’ বলে মুখ পুড়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ২০১৪-র তুলনায় ১১ আসন কমে ২২ হয়। তৃণমূল তা ভুলে গিয়েছে তাই নরেন্দ্র মোদীর ৪০০-পারের সমালোচনায় ‘উদার আনন্দে’ মেতেছে। মোদীর নেতৃত্বে নতুন এনডিএ সরকার স্বচ্ছন্দে পাঁচ বছর রাজত্ব করবে মনে হয় যদি না তিনি নিজে কোনো অন্তর্বর্তী নির্বাচন চান। পাঁচ বছর আগে বাম ভোট রামে গিয়েছিল। এবার তা ঘাস খেল। ‘লাল পতাকা লজ্জার পতাকা’ বলে তৃণমূল তাকে ঘাস দিয়ে ঢেকেছিল। লজ্জার মাথা খেয়ে সেই লালেরাই এবার তৃণমূলকে জিতিয়েছে। ২০২১-এর রাজ্য ভোটে প্রচার হয় ‘বিজেপি ডাকাত আটকাতে চোর তৃণমূলকে ভোট দিন’।

২০২৪-এর ভোটে তার কপি হয়েছে। সারা দেশে বিজেপির ভোট বেড়েছে ০.৮ শতাংশ। ৬৩ আসন কমেছে। একটি সমীক্ষা বলছে, বিজেপি ৮ শতাংশ মুসলমান ভোট পেয়েছে যাদের বেশিরভাগ অনগ্রসর আর গরিব শ্রেণীর মানুষ। বিজেপি উত্তরপ্রদেশে মাত্র ২ শতাংশ মুসলমান ভোট পেয়েছে অথচ গুজরাটে পেয়েছে ২৬ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে ৯২ শতাংশ মুসলমান ভোট পেয়েছে তৃণমূল। যাতে মিশে রয়েছে বাম-কংগ্রেসের ভোট। জাতীয় রাজনীতিতে মূল ধারার তিনটি দলের মধ্যে বিজেপি এখন কংগ্রেসের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। আর বামেরা অবলুপ্তির পথে। তারা চারটি আসন পেয়েছে। ৫৪২টি আসনের মধ্যে তা ঠাউর করা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তারা নিজেদের মুছে দিয়েছে। ভোট বৃদ্ধি তো দূর অস্ত, উলটে ২.৫ শতাংশ ভোট তারা তৃণমূলকে দিয়ে দিয়েছে। বাম ভোটাররা নিজেদের দলের উপরেই আস্থা রাখতে পারেনি। তাদের ২৩ আসনের ভিতর ২১ আসনে জমানত জব্দ হয়েছে।

বিদেশি বামেরা তাদের নতুন বন্ধুকে ‘চোর তৃণমূল’ বলে। এবার থেকে তারা ‘বন্ধু তৃণমূল’ বলে ডাকবে। জুন মাসে তারা একসঙ্গে চারটি সাংগঠনিক পর্যালোচনা বৈঠক করছে। এখন তাদের হাতে ৫ শতাংশ ভোট হয়েছে। নিজের মাথায় হাত রেখে ভস্ম হয়েছিল ভস্মাসুর। রাজ্যের বাম ভোটাররাও তাই। ১৪ আসনে বিজেপির ভোট কেটে তারা মমতাকে আসন উপহার দিয়েছে। তাতে কিছু সুফল পেয়েছে বিজেপিও। তবে সিংহভাগ গুছিয়েছে তৃণমূল। বিজেমূল তত্ত্ব খারিজ হওয়ার পর রাজ্যে নতুন তত্ত্বের আমদানি হয়েছে— ‘সিপিএম তৃণমূল এক গাছে দুটি ফুল’। ১৪টি আসনে নিজেদের ধ্বংস করে মমতাকে জিতিয়েছে তারা। ’২১-এর বিধানসভার নিরিখে মমতার ভোট কমেছে আর বিজেপির বেড়েছে। ২০০৮ সালে মনোমোহন সিংহের সরকারের ওপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে মমতাকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল বামেরা।

> **মমতা হয়তো সেই আশাতেই বুক বাঁধছেন কবে সিপিএম ইনকিলাব ছেড়ে ‘জয় বাংলা’ বলবে। সেদিন বোধহয় বেশি দূরে নয়। তবে রাজ্যের মানুষ তা মেনে নেবেন তো?**

সংসদে মনমোহন সিংহ বলেছিলেন বামেরা ‘ব্ল্যাকমেলারদের দল’। তারপরেই মমতা পান ১৯ আসন আর বামেরা ১৫। ২০১১-তে ভুল জমি নীতি নিয়ে নিজেদের কবর খোঁড়ে সিপিএম। তারপর পর্যায়ক্রমে রাজ্য থেকে উবে যেতে থাকে বামেরা। আগেই লিখেছি দু’ বছর ধরে, সন্ত্রাস হতে পারে এই ভীতি থেকেই আনুমানিক ২ কোটি ৭০ লক্ষ ভোটার মমতাকে সমর্থন করেছে আর বিজেপিকে প্রায় ২ কোটি ৩৫ লক্ষ।

মমতা ভালো জানেন তফাতটা যে বেশি নয়। পাশের রাজ্য ওড়িশার দখল নিয়েছে বিজেপি। সেখানে ২৪ বছরের পট্টনায়ক সরকারকে যদি তারা সরাতে পারে মমতার ১৫ বছরের সরকারকে কেন তারা ২০২৬-এ হটাতে পারবে না? তখন কী বামেরা হবে মমতার আশ্রয়? তাদের যৎসামান্য ৫ শতাংশ ভোট তারা কি মমতার পায়ে আবার নিবেদন করবে? তাহলে বলতেই হবে ‘লজ্জা, লজ্জা। বামপন্থার মাথায় পা’। মমতা হয়তো সেই আশাতেই বুক বাঁধছেন কবে সিপিএম ইনকিলাব ছেড়ে ‘জয় বাংলা’ বলবে। সেদিন বোধহয় বেশি দূরে নয়। তবে রাজ্যের মানুষ তা মেনে নেবেন তো? এই মুহূর্তে তা হাস্যকর লাগতে পারে। তবে মানুষের ওপর বিশ্বাস কিছুতেই হারাব না। কারণ ‘মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ’। □

বিপর্যয়ের মধ্যে জয়ও বিজেপির

আত্মতুষ্টেষু দিদি,

আনন্দ হওয়ারই কথা। ২২ আসন থেকে বেড়ে ২৯ হয়েছে আপনার দলের লোকসভা আসনের সংখ্যা। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে ৩০ পার করতে চেয়ে ১২তেই আটকে গিয়েছে বিজেপি। ২০১৯ সালের চেয়ে ৬টি আসন কম। সেবারে জেতা আটটি আসন হাতছাড়া হয়েছে। নতুন করে এসেছে কাঁথি ও তমলুক। কিন্তু দিদি, একটা কথা মাতায় রাখতে হবে, আসনসংখ্যা কম হলেও পরিসংখ্যান অনুযায়ী অতীতের তুলনায় বিজেপির ভালো ফল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, যা ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আশাপ্রদ। ফলে আপনার খুব বেশি আত্মতুষ্টির কারণ নেই।

গণতন্ত্রে আসন সংখ্যাই আসল কথা। সেটা আমি জানি দিদি। সেই হিসাবে আপনি ১৭টি আসন বেশি পেয়ে অনেকটাই এগিয়ে। কিন্তু রাজনীতিতে পরিসংখ্যানও অনেক কথা বলে। হিসাবটা আপনাকে আশা করি বোঝাতে পারব। ২০১৯ সালে ১৮ আসনে জয়ের পাশাপাশি বিজেপি রাজ্যে ৪০.৬০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। সেই তুলনায় এবার ভোট কমেছে। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় বেড়েছে প্রাপ্ত ভোটের হার। সেবার ছিল ৩৭.৯৭ শতাংশ। এবার সেটা বেড়ে ৩৮.৭৩ শতাংশ হয়েছে। আসন সংখ্যার বিচারে বিজেপি পিছিয়ে থাকলেও পরিসংখ্যানের দিক থেকে দলের অগ্রগতি হয়েছে। সেই পরিসংখ্যানের মধ্যে রয়েছে রাজ্যের পুর এলাকার ফল। রাজ্যের ১২১টি পুরসভার মধ্যে ৬৯টিতেই এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। দুটিতে কংগ্রেস এবং শাসক তৃণমূল ৫১টিতে। এর বাইরে রাজ্যের ৬টি পুর নিগমের ফলও বিজেপির পক্ষে অতীতের তুলনায় ভালো।

এবার বিজেপি যে শহরাঞ্চলে তুলনামূলক ভালো ফল করেছে তার প্রমাণ কলকাতাতেই। কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ড রয়েছে কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, যাদবপুর ও ডায়মন্ড হারবার লোকসভা আসনের মধ্যে। ২০২১ সালে হওয়া পুর নির্বাচনে তৃণমূল জিতেছিল ১৩৭টিতে। আর বিজেপি জয় পেয়েছিল ৩টিতে। সবকটিই কলকাতা উত্তরে। লোকসভা নির্বাচনের ফলের নিরিখে সেই উত্তরে বিজেপি এগিয়ে ২৪টি ওয়ার্ডে। ২০১৯ সালের তুলনায় চারটি ওয়ার্ড বেড়েছে। তবে কলকাতা দক্ষিণের ২৬টি ওয়ার্ডে ২০১৯ সালে বিজেপি এগিয়ে থাকলেও এবার সেটা কমে হয়েছে ২০। তবে সব মিলিয়ে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ের তুলনায় এবার কলকাতায় ফল অনেকটাই ভালো।

দিদি, আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে, রাজ্যে এমন ৯টি আসন রয়েছে যেখানে বিজেপি অতীতে কখনো এগিয়ে থাকেনি। এর মধ্যে রয়েছে বড়ঞা, জঙ্গিপুর, সন্দেশখালি আসন। এছাড়া রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক, পাশকুড়া পূর্ব, নন্দকুমার, মহিষাদল, চণ্ডীপুর, রামনগর আসন। প্রসঙ্গত, তমলুক একমাত্র লোকসভা

> এবার যা ফল হয়েছে তাতে বিজেপির একেবারে হতাশ হয়ে যাওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। আনন্দ নাই হতে পারে, কিন্তু শিক্ষা নেওয়ার বড় সুযোগ এনে দিয়েছে এবারের ফল।

যেখানে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে ৭টি বিধানসভা এলাকাতেই। তবে বিজেপি বেশি খুশি জঙ্গিপুরের ফল নিয়ে। ২০২১ সালে লক্ষাধিক ভোটে হারা আসনে এবার এগিয়ে তারা।

২০২১ সালে বিজেপি মোট ৭৭টি বিধানসভা আসন জিতেছিল পশ্চিমবঙ্গে। সেই জেতা আসনগুলির মধ্যে ৬২টিতে এবারেও এগিয়ে তারা। এর মধ্যে আবার ৪টি আসন ছাড়া সর্বত্র ব্যবধান বেড়েছে পদ্মের। আবার ২০২১ সালেও জিততে না-পারা এমন ২৮টি আসনেও এবার বিজেপি এগিয়ে রয়েছে।

এছাড়াও রাজ্যে ৭০টি বিধানসভা আসনে কম ভোটের ব্যবধানে পিছিয়ে দল। সেই তালিকা অনুযায়ী, ১০ হাজারের কম ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা আসনের সংখ্যা ৪৯। আর ১০ হাজারের বেশি কিন্তু ১৫ হাজারের কম ভোটের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা বিধানসভার সংখ্যা ২১টি।

তবে দিদি, আমি মনে করি এগিয়ে থাকার এত পরিসংখ্যান থাকলেও বিজেপিকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। সংগঠনের জোর আরও বাড়াতে হবে। কিন্তু আপনার জন্য স্বস্তি কিন্তু রইল না। টাকার লোভ দেখিয়ে যে ভোট আপনি পেয়েছেন, সে ভোট আগামী ভোটেও মিলবে এমন গ্যারান্টি কোথায়? বরং, আপনার দল ও সরকারের আরও দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসে গেলে মুশকিল হতেই পারে। তাই আপনার অনুগত ভাই হিসাবে অনুরোধ, এবার কিছু গঠনমূলক কাজ করুন। রাজ্যে বেশি আসন মিললেও দিল্লিতে সরকার গড়ার স্বপ্ন তো মেটেনি। এবার অন্তত সৎ উপায়ে রাজ্যের মানুষের জন্য কিছু করুন। কারণ, এটা ঠিক, যা ফল হয়েছে তাতে বিজেপির একেবারে হতাশ হয়ে যাওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। আনন্দ নাই-ই হতে পারে, কিন্তু শিক্ষা নেওয়ার বড়ো সুযোগ এনে দিয়েছে এবারের ফল। □

অতিথি কলম

অতনু বিশ্বাস

গণতন্ত্রের চাটুতে সেঁকা একটি রাজনৈতিক রুটি

চাটুর নীচে আঁচ যত তীব্র হবে, রুটি পুড়ে যাওয়া রুখতে ততই গরম চাটুতে রুটিকে উলটে পালটে দেওয়ার কাজে হতে হবে আরও সক্রিয়।

'গণতন্ত্র' হলো রাজনীতির গরম চাটুতে সেঁকা রুটি। যদিও এটি একটি রাজনৈতিক প্রবাদ। রুটিটি যাতে পুড়ে না যায় তার জন্য সেঁকার সময় তাকে বার বার উলটে পালটে দেওয়াটা দেশের ভোটদাতা তথা নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য। তাদের এহেন করণীয়ের অর্থ কি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তারা নতুন একটি সরকার নির্বাচন করবে? ঘটনা কিন্তু তা নয়। যদিও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের চলমান প্রবাহের সাক্ষী থাকে দেশবাসী প্রতিবার, প্রতিটি ক্ষেত্রে। তা কোনো সরকার পরিবর্তন হোক বা সেই সরকার পুনর্নির্বাচিত হলেও তার আসন সংখ্যা কমে বা বেড়ে যাওয়া হোক। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতা ধরে রাখলেও বা দলটির শক্তি আগের তুলনায় বেড়ে বা কমে না গেলেও, রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির সূক্ষ্ম পরিবর্তন অনবরত চলতেই থাকে। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় 'প্রতিনিয়ত পরিবর্তন' একটি ধ্রুবসত্য।

২০১৯-এ প্রাপ্ত আসন সংখ্যার নিরিখে ২০২৪-এর নির্বাচনে বিজেপির আসন কমেছে ৬৩টি। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ২০১৯-এর তুলনায় বেড়েছে ৪৭টি। কিন্তু এটাই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চিত্র তো নয়। ২০১৯ সালের নিরিখে এই নির্বাচনে মোট ৫৪৩টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২০৯টি আসনে অন্য দলের প্রার্থীরা সাংসদ হিসেবে জয়যুক্ত হয়েছেন, যা মোট আসনের ৩৮.৪ শতাংশ। ভিন্ন দলের সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার কারণে বাস্তবিকভাবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে এই ২০৯টি লোকসভা আসনে।

চাটুতে উলটোতে থাকে রুটি : প্রতি ১০ জন জয়ী সংসদ সদস্যের মধ্যে ৪ জন যদি অন্য দলের হন (আগের নির্বাচনের ফলাফলের প্রেক্ষিতে), তাহলে এই ঘটনাকে কি 'পরিবর্তন' আখ্যা দেওয়া যায়? যদিও প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে একই ঘটনা পরম্পরা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৪ সালে প্রাপ্ত আসনের তুলনায় ২০১৯-এ বিজেপি ২১টি আসন বেশি পায়। ২০১৯-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা বেড়েছিল ৮টি। ২০১৪ ও ২০১৯ সালের দুটি নির্বাচনের আসন-সংখ্যাতত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো— ২০১৯-এ ১৮৭টি লোকসভা আসনে রাজনৈতিক পটচিত্র পাওয়া যায়, ২০১৪-র ফলাফলের বিপরীত ফলাফল সামনে আসে এই ১৮৭টি আসনে। এই আসনগুলিতে অন্য দলের সাংসদরা নির্বাচিত হয়েছিলেন যা মোট আসনের ৩৪.৪ শতাংশ।

সাম্প্রতিক একটি বিধানসভা নির্বাচনের উদাহরণ টানলে দেখা যাবে যে ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেস ২০১৬ সালের নির্বাচনে তার প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ধরে রাখতে সমর্থ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী বাম-কংগ্রেসের বিরোধী জোটের স্থান ২০২১-এর ভোটে পুরোপুরি দখল করে বিজেপি এবং প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গে। যদিও আসল 'পরিবর্তন' ছিল অন্য কিছু। ২৯২টি বিধানসভা আসনের ৪৪ শতাংশে, অর্থাৎ ১২৯টি আসনে বিজয়ী বিধায়করা ছিলেন অন্য দলের। অর্থাৎ ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে ২০২১-এর ভোটে পশ্চিমঙ্গের ১২৯টি বিধানসভা আসনে রাজনৈতিক পালাবদল হয়।

২০২১-এর তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে ডিএমকে নেতৃত্বাধীন জোট পুনর্বিজয়ী হলেও মোট ২৩৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৪৭.৪ শতাংশ অর্থাৎ ১১১টি আসনে অন্য দলের প্রার্থীরা জয়ী হন। ২০২১ সালে এই আসনগুলিতে ২০১৬ সালের নির্বাচনের ফল বাস্তবিকই উলটে যায়।

ভোট-পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ : বিগত নির্বাচনগুলির তুলনায় সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে যে ভোটদাতারা ভোটদানের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দের রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী পরিবর্তন করেছেন, তার প্রতিফলন ঘটেছে ভোটযন্ত্রে। কিন্তু পছন্দের প্রার্থী পরিবর্তনের পক্ষ নেওয়া জনতার অনুপাত নির্ধারণ করা বেশ কঠিন। ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট কমেছে ০.৮ শতাংশ। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট সামান্য হলেও সামগ্রিকভাবে ১.৮ শতাংশ বেড়েছে। সমাজবাদী পার্টির প্রাপ্ত ভোট বেড়েছে ০.২ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে এটা পরিষ্কার যে প্রদত্ত ভোটের শতকরা দশমিকের একটি ভগ্নাংশ অন্য দলগুলির পক্ষে গিয়েছে, যার পরিণামে সেই দলগুলির ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই দলগুলির প্রাপ্ত ভোটের এই অতিরিক্ত অংশটাই হলো নতুন দলকে বেছে নেওয়া রাজনৈতিক পরিবর্তনের মনোভাবাপন্ন জনতার ভোট। এইভাবে বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রাপ্ত খণ্ড খণ্ড পরিসংখ্যানগুলি

যোগ করলে দেখা যায় যে গোটা দেশের প্রায় ১০-১২ শতাংশ ভোটদাতা এবারে তাদের পছন্দের দল ও প্রার্থী পরিবর্তন করেছেন। যদিও নির্ধারিত এই পরিসংখ্যান বাস্তবতার মূল্যায়নের ধারে পাশে হয়তো নয়। তাও এহেন সংখ্যাতত্ত্বকে বাস্তবতার কাছাকাছি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

পরিসংখ্যানগুলিকে আরও একটু তলিয়ে দেখা : এই নির্বাচনে প্রতিটি রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা পরিবর্তন (হ্রাস বা বৃদ্ধি)-কে যোগ করলে শিফটিং বা পরিবর্তনশীল ভোটের একটি বৃহত্তর অনুপাত পাওয়া যাবে। প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করলে এই অনুপাত আরও বাড়বে। এর পাশাপাশি, এই নির্বাচনে গোটা দেশে ব্যবহৃত সব ইভিএমের থেকে প্রাপ্ত ভোট সংক্রান্ত সব তথ্য যদি একত্রিত করা যায় এবং বিগত নির্বাচনগুলির ইভিএমের তথ্যের সঙ্গে তার একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায়, তবে তা দেশব্যাপী পরিবর্তনশীল ভোট শতাংশের একটি ন্যূনতম সীমা বা প্রকৃত নিম্নসীমা নির্ধারণে সহায়ক হবে।

যদিও এহেন পরিসংখ্যানও একটি 'নিম্নসীমা'-কেই নির্দেশ করে মাত্র। কারণ অগুনতি উদাহরণ রয়েছে যেখানে— একজন ভোটার 'পার্টি এ'-র বদলে বেছে নিলেন 'পার্টি বি'-কে। দ্বিতীয়জন 'পার্টি বি'-র জায়গায় 'পার্টি-সি'-কে এবং তৃতীয়জন 'পার্টি সি'-র পরিবর্তে চয়ন করলেন 'পার্টি এ'-কে। এর ফলে ব্যক্তিগত স্তরে ভোটদান ও চয়নিত প্রার্থী পরিবর্তিত হলেও সামগ্রিক ভোট পরিসংখ্যানে এর কোনো প্রভাব নেই। এছাড়াও, প্রতিটি নির্বাচনে পুরনো অনেক ভোটদাতা নানা কারণে বাদ পড়েন এবং নতুন অনেক ভোটার সংযোজিত হন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। সংযোজন-বিয়োজনের এই নিরন্তর প্রক্রিয়ায় ভোট পরিবর্তনের ধারাটিও অনুরূপভাবে প্রভাবিত হতে থাকে।

মত পরিবর্তনের চাকা এগিয়ে চলে প্রতিনিয়ত : দোদুল্যমান বা ফ্লোটিং ভোটাররা (যারা নানা পরিস্থিতিতে তাদের পছন্দের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর পক্ষে নিজেদের ভোট পরিবর্তন করে থাকেন)— দেশজুড়ে তারা কিন্তু একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রয়েছেন। নয়তো ২০০৯ সালে গোটা দেশে ১৯ শতাংশ ভোট পাওয়া বিজেপি ২০১৯ সালে কীভাবে প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩৮ শতাংশ ভোট পায়? ২০০৯ সালে ২৮.৫ শতাংশ ভোট পাওয়া কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট ২০১৪-তে কীভাবে কমে ১৯ শতাংশে দাঁড়ায়?

ভোট পরিবর্তনের আলোচনার এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠতে পারে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের সংগৃহীত ভোট ছিল ৩৭ শতাংশ। ২০১১-তে ক্ষমতাচ্যুত হলেও তারা সেই বিধানসভা নির্বাচনে ৩০ শতাংশ ভোট ধরে রাখে। কিন্তু ২০২১ সালে, বামপন্থীদের প্রাপ্ত ভোট কমে দাঁড়ায় ৫ শতাংশে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামেদের ভোট দাঁড়িয়েছে ৫.৬৭ শতাংশে।

অতএব, উপরোক্ত সবরকম পরিসংখ্যান ও তথ্য বিশ্লেষণ করে এটা অনুমেয় যে দেশের মোট ভোটারের ৫০ শতাংশের বেশি, প্রায় ৬০ শতাংশের কাছাকাছি ভোটদাতা হলেন সেই দোদুল্যমান বা ফ্লোটিং ভোটার, যারা বিভিন্ন নির্বাচনে তাদের পছন্দের দল ও প্রার্থী পরিবর্তন করেছেন বা করে থাকেন। ২০১৪ সালের একটি সিএসডিএস সমীক্ষা অনুযায়ী ৪৩ শতাংশ ভারতীয় ভোটদাতা 'রাজনৈতিক হাওয়া' অনুসরণ করে ভোটদান করে থাকেন। অর্থাৎ, হাওয়া যেই দিকে বইছে বা যেদিকে পাল্লা ভারী— সেই দল বা প্রার্থীকেই তারা বেছে নেন।

বিশ্বব্যাপী সমীকরণ : ভোটদানের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশগুলির অবস্থা একটু পর্যালোচনা করা যাক। ২০১২ সালে প্রকাশিত তাঁর লেখা বই 'দ্য স্যুইং ভোট : দ্য আনট্যাপড় পাওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্টস্'-এ সাংবাদিক লিন্ডা কিলিয়ান লিখছেন যে আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো ভোটিং ব্লক হলো বা ভোটদাতাদের শ্রেণী হলো ৪০ শতাংশ আমেরিকান ভোটার যারা কোনো নির্দিষ্ট দলের অনুগত ভোটার নন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও যুক্ত নন। মার্কিন দেশে তাদের পরিচয় 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোটার' হিসেবে। তারা সাধারণত কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীকে ইস্যুভিত্তিক সমর্থন জানিয়ে ভোটদান করে থাকেন। নির্দিষ্ট ইস্যুতে প্রার্থীকে সমর্থন করে চলা এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোটাররা কিন্তু আমেরিকার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত পরিসরে একটি বিরাট স্থান দখল করে রয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই প্রতিটি নির্বাচনে এই ভোটাররা বিশেষ প্রভাব ফেলেছেন এবং তাদের সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ব্রিটিশ নির্বাচকমণ্ডলীও প্রায় একই রকম অস্থিরমতি। 'ব্রিটিশ ইলেকশন স্টাডি' বা ব্রিটেনের একটি নির্বাচনী সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০১০ থেকে ২০১৭-র মধ্যে সংঘটিত তিনটি নির্বাচনে এই অস্থিরচিত্ত ব্রিটিশ ভোটারদের ৪৯ শতাংশ প্রতিবার একই দলকে ভোট দেননি। আবার ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৪৩ শতাংশ ভোটার ভোটদানের ক্ষেত্রে তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দলকে পরিবর্তন করেছেন। এই তথ্যের দ্বারা এটা পরিষ্কার যে ব্রিটেনে ফ্লোটিং বা দোদুল্যমান ভোটারদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। কারণ একজন অস্থিরমতি ভোটার অন্য দলে ভোট দিতেও পারেন, আবার নাও দিতে পারেন।

ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর অর্ধেকেরও বেশি হলো এই ফ্লোটিং ভোটার। প্রতিটি নির্বাচনে তাদের পছন্দের দল ও প্রার্থী হয় পরিবর্তিত। নির্বাচন এলে তারা যে কোনো দিকে ঢলতে পারে। যদিও তাদের সেই দিক পরিবর্তন এবং তার পরিণামে সংঘটিত স্যুইঙের পরিমাণ নির্ধারণ খুবই কঠিন একটা কাজ। প্রতিটি লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রেই এটা সত্যি। রাজনৈতিক দলগুলিও এই বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ও ওয়াকিবহাল। তা না হলে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন জয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে তারাও নির্বাচনী প্রচারে ঝাঁপায় কেন? তাই গণতন্ত্রের এই রুটি সেঁকার সময় ক্রমাগত উলটে পালটে দিতে হবে। চাটুর নীচে আঁচ যত তীব্র হবে, রুটি পুড়ে যাওয়া রুখতে ততই গরম চাটুতে রুটিকে উলটে পালটে দেওয়ার কাজে হতে হবে আরও সক্রিয়। নির্বাচনী হাওয়ার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়তো সম্ভব, সেই হাওয়া কোন দিকে বইছে তাও হয়তো বোঝা যাবে। নির্বাচনী ফলাফল নির্ধারণে সেই হাওয়ার গতিপ্রকৃতির গুরুত্ব হতে পারে সর্বাধিক। কিন্তু দেশের আবহমণ্ডলের গণতান্ত্রিক বাতাসে সবসময়ই প্রবাহিত হয়ে চলেছে 'পরিবর্তন'।

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতার অধ্যাপক)

ভারত মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বৈঠকে প্রতিরক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিয়ে আলোচনা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী টানা তিনবার শপথ নেওয়ার পরে ভারত-মার্কিন যৌথ সম্পর্কের আরও উন্নতিতে সচেষ্ট হলো উভয় দেশই। তারই ফলশ্রুতিতে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে নয়া দিল্লিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হলেন মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সালিভান। ভারত-আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে তৈরি 'ক্রিটিকাল অ্যান্ড ইমার্জিং টেকনোলজি'র (আইসিইটি) বার্ষিক বৈঠকেও যোগ দিয়েছেন সালিভান। বৈঠকের পরে এস জয়শঙ্কর সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সালিভানের সঙ্গে।

আমরা আত্মবিশ্বাসী, ভারত-আমেরিকা কৌশলগত অংশীদারিত্ব আমাদের নতুন পর্বে আরও শক্তিশালী হবে।' প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে প্রতিরক্ষা, এআই, সেমিকন্ডাক্টর নিরাপত্তা ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়ানো নিয়ে কথা হয়েছে সালিভানের। সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক জি-৭ বৈঠকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে তাঁর ইতিবাচক আলোচনা মনে করিয়ে দিয়েছেন মোদী। তিনি দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ারও আশা প্রকাশ করেন। মোদী, দোভাল ছাড়াও দেশের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গেও আলাদাভাবে বৈঠকে মিলিত হন জ্যাগ সালিভান।

মার্কিন-ভারত উদ্যোগের সমালোচনা-মূলক এবং উদীয়মান প্রযুক্তি (আইসিইটি)-র বিষয়ে দোভালের সঙ্গে দ্বিতীয় বৈঠক ছিল এটি। নয়াদিল্লির এই বৈঠকে দুই পক্ষই প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যৌথ কৌশলগত অংশীদারিত্ব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছে, বিবৃতি দিয়ে একথা জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। এর আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্চ মাসে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছিল। এদিকে কোয়াডে জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারত-মার্কিন পার্টনারশিপ নিয়েও আলোচনা হয় ডোভালও সালিভানের মধ্যে।

হোয়াইট হাউসের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই দেশের সরকারের মধ্যে বাণিজ্য, পড়াশোনা, গবেষণা নিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন দোভাল ও সালিভান। এদিকে আগামী পাঁচবছরের জন্য সেমিকন্ডাক্টর গবেষণা এবং উৎপাদন-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য ভারত-মার্কিন যৌথ তহবিলে ৯০ মিলিয়ন ডলার দেওয়া নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও এই অর্থ ব্যবহার করে দুই দেশ যৌথভাবে স্বচ্ছ জ্বালানি, কৃষি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, খাদ্য সুরক্ষা, অতিমারীর প্রস্তুতির মতো ইস্যু নিয়ে গবেষণা করবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে ভারতের ইসরো এবং মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার নভোশ্চরদের একসঙ্গে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে যাওয়া নিয়েও আলোচনা হয় দুই দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের বৈঠকে। এদিকে নাসা এবং ইসরোর যৌথ উদ্যোগে তৈরি অ্যাপেরচার র‍্যাডার লঞ্চ করার প্রস্তুতি নিয়ে কথা হয় দু'পক্ষের। এই র‍্যাডার গোটা বিশ্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্র তৈরি করবে প্রতি ১২ দিনে। প্রসঙ্গত, এমকিউ-৯বি প্ল্যাটফর্ম কেনার বিষয়েও সালিভানের সঙ্গে কথা বলেন দোভাল। এছাড়া হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, আমেরিকা ও ভারত ল্যান্ড ওয়ারফেয়ার সিস্টেমের যৌথ উৎপাদন নিয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। এদিকে জেনারেল অ্যাটমিক্স এবং ভারতীয় স্টার্টআপ ১১৪ এআই-এর মধ্যে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত পার্টনারশিপ নিয়েও কথা হয় বৈঠকে। অন্যদিকে জেনারেল অ্যাটমিক এবং ভারতের স্টার্টআপ সংস্থা থার্ডআইটেক একসঙ্গে মিলে সেমিকন্ডাক্টর ডিডাইন করবে এবং উৎপাদন করবে। প্রতিরক্ষা খাতে সেই সেমিকন্ডাক্টর ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস।

প্রসঙ্গত, গত বছর একই সময়ে ভারত-মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পর্যায়ে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে চীনের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের ওপর নির্দিষ্ট ফোকাস-সহ এশিয়াজুড়ে বেজিঙের বিস্তৃত পদচারণার বিষয়ে এক বৈঠকে আলোচনা হয়। ইউএস ইন্দো- প্যাসিফিক কোঅর্ডিনেটর কার্ট ক্যাম্পবেল সেই বৈঠকে জ্যাক সালিভানের সঙ্গে ছিলেন। ভারতের পাশাপাশি মায়ানমারে তার উপস্থিতি প্রসারিত করছে। আর এটিই বেজিংকে আগামী বছরগুলোতে ভারত মহাসাগর অঞ্চলজুড়ে শক্তি প্রদর্শন করতে সক্ষম করবে।

এছাড়া বৈঠকে এও বলা হয়েছিল, ভারত মহাসাগরে আধিপত্য বিস্তারের সব পরিকল্পনাই চীনের রয়েছে এবং বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা ছাড়াও হিমালয়ের দেশগুলোতেও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে তারা। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর অন্যান্য আঞ্চলিক বিষয়গুলোও গত বছরের বৈঠকে আলোচ্যসূচিতে ছিল। ভারতের দুই প্রতিবেশী— মালদ্বীপ ও বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে ভারত অভিমত দিয়েছিল যে, তার প্রতিবেশী দেশগুলোতে এমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া উচিত নয় যা ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিরূপ প্রভাব ফেলে। ভারত মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বৈঠকে গত বছরের অ্যাজেন্ডা এবার না থাকলেও তার ফলো-আপ কতদূর হলো, সে বিষয়েও আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর।

নির্বাচনে জেতা মানেই কলঙ্কমুক্ত হওয়া নয়

সাধন কুমার পাল

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর দেখা গেল এক্সিট পোলের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এমনটা হলো? এক্সিট পোল ঘোষণা হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন যে তৃণমূল ২৮ থেকে ৩০টি আসন পাবে। সে সময় মুখ্যমন্ত্রীর শরীরি ভাষা ও আত্মবিশ্বাস দেখে অনেকেই অবাক হয়েছিল। ওয়াকিবহাল মহল কিন্তু তখনই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যে ভিতরে অন্যরকম কিছু হয়ে যায়নি তো। ফল প্রকাশের পর দেখা গেল ঠিক তাই হয়েছে। তৃণমূল ২৯টি লোকসভার আসন দখল করেছে। তাহলে এবার প্রশ্ন তৃণমূলের ফলাফলের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কেমন করে এতটা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন? তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা ব্যানার্জির সভা গলিতে, ফাঁকা মাঠ, ফাঁকা চেয়ারের ছবি সবাই দেখেছে। নির্বাচনের সময় মমতা ব্যানার্জির রোড শো-গুলোতে রাস্তার দু'পাশ খাঁ খাঁ করছে এই দৃশ্যও সবাই দেখেছে। নির্বাচনের সময় জনসভাতে মানুষ জোটাতে না পারা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী ত্রিশটা আসনে জয়ী হওয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হলেন কীসের জোরে।

এ ব্যাপারে একটি সোজাসাপ্টা ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়েছে যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য মহিলারা দু'হাত ভরে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে। তাই যদি হবে তাহলে বিজেপি ১২টি লোকসভার আসন-সহ ৩৮.৭৩ শতাংশ ভোট পেল কী করে? ৩৮.৭৩ শতাংশের মধ্যে কি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছে এমন মানুষ নেই? এদের মধ্যে কি গরিব মানুষ নেই? এবারের নির্বাচনে কোচবিহার লোকসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৭৮৮৩৭৫টি এবং বিজেপি পেয়েছে ৭৪৯১২৫টি ভোট। অর্থাৎ বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ে মাত্র ৩৯২৫০টি ভোট কম পেয়েছে। এর থেকেই প্রমাণ হয় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাওয়া লক্ষ লক্ষ মা-বোন বিজেপিকেও ভোট দিয়েছে। দুর্নীতি, মিথ্যা ভাষণ, অসত্যতা সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেস লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের

> তৃণমূলনেত্রী হাবেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন নির্বাচনে জিতেছেন মানে তিনি সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থা, তদন্ত ব্যবস্থাকে প্রমাণ করে দিতে হবে যে নির্বাচনে জেতা মানেই দোষমুক্ত হওয়া নয়।

জন্য বিপুল জয় পেয়েছে এই বিশ্লেষণ অতি সরলীকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। হ্যাঁ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস যে প্রচুর ভোট পাবে এটা তৃণমূল নেত্রীর মতো পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদের আন্দাজ করতে পারা স্বাভাবিক যে এই ভোট জয়ের জন্য পর্যাপ্ত নয়।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য মমতা সরকারের মতো একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে মানুষ ঢেলে ভোট দিয়েছে, এই ন্যারেটিভের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের নিষ্পাপ মা- বোনেদের অপমান করা হচ্ছে। হতে পারে মা-বোনেদের একটা অংশ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য ভোট দিয়েছেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গের বেকারত্ব ও কর্মহীনতার জন্য অর্থনীতিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে এক হাজার টাকা একটি পরিবারের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় একটা পরিমাণ। না খেয়ে থাকা, অভাবে থাকা পরিবারগুলির কাছে এই ১০০০ টাকা অনেক বড়ো বিষয়। ফলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধাভোগী পরিবারগুলির একটি অংশ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মানুষের এই দুর্বলতাকে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটে কাজে লাগিয়েছে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই বিষয়টি মোকাবিলা করতে গেলে উপযুক্ত বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও সংগঠন চাই। যারা এই মানুষগুলোকে বোঝাতে পারবে মমতা ব্যানার্জির বিকল্প বেছে নিলে তারা এক হাজার টাকার বেশি পেতে পারে। এটা বলার

ফঃ ২

অপেক্ষা রাখে না যে প্রতিটি পরিবারে গিয়ে বোঝানোর মতো ঠাণ্ডা মাথার সাহসী সহমর্মী রাজনৈতিক কর্মী ও সংগঠন বিরোধী দলগুলির হাতে থাকলে নির্বাচনের ফলাফল অন্যরকম হতে পারতো।

লোকসভার সামগ্রিক ফলাফলের নিরিখে এক্সিট পোলে যা দেখানো হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল বিজেপি সবচাইতে বড়োদল হিসেবে সবচাইতে বেশি সংখ্যক আসন পাবে। আসন সংখ্যার হিসেব হয়তো এক্সিট পোলের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ মেলেনি। কিন্তু সবচেয়ে বড়োদল হিসেবে বিজেপির আবির্ভাব এটা কিন্তু এক্সিট পোলের আভাসে ছিল। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এক্সিট পোলের ফলাফল বিপরীত হয়ে গেল। এখানে দেখানো হয়েছিল বিজেপি হবে এক নম্বর দল এবং তৃণমূল হবে দু' নম্বর দল। কিন্তু হলো তার উলটো। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আসন সংখ্যা এবং ভোটের শতাংশ কোনোটাই এক্সিট পোলের সঙ্গে মেলেনি। হাজার দুর্নীতি সত্ত্বেও মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে যেভাবে ভোট দিয়েছে তাতে সবাই এক কথায় অবাক। শুধু বিভিন্ন দল নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরাও কিন্তু এতে অবাক। তবে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস যে সমস্ত আসনে জিতেছে এর প্রত্যেকটি আসনের বুথ ধরে বিশ্লেষণ করলে মমতা ব্যানার্জির আত্মবিশ্বাসের ও তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের আসল রহস্য ধরা পড়বে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি শুধুমাত্র কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফল বিশ্লেষণ করছি। কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের মাত্র ১৬০টি বুথ তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ এই লোকসভার ২০৪৩টি বুথের মধ্যে মাত্র ৮ শতাংশ বুথ ফ্যাক্টর হয়েছে বলে একটি তথ্য থেকে উঠে এসেছে। এই বুথগুলোতে তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার প্রাপ্ত ভোট ১ লক্ষ ৬ হাজার ৮২৯টি। সেখানে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক ভোট পেয়েছেন মাত্র ৬ হাজার ৯৯০টি। তৃণমূল ৯৯ হাজার ৮৩৯টি ভোটে লিড পেয়েছে। কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের বহু বুথে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল প্রার্থী ৮০০ থেকে ১ হাজার পর্যন্ত ভোট পেয়েছেন। সেখানে বিজেপি প্রার্থীর ভোট ৮, ১০, ১২, ৩০, ৪০টি করে রয়েছে। অর্থাৎ তিন সংখ্যার ভোটে পৌঁছোতে পারেনি এইরকম বুথের সংখ্যা ১৬০টি। কী কারণে ওই বুথগুলোতে তৃণমূলের ভোট বিজেপির চাইতে ৯০ শতাংশের বেশি হলো তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তাহলে এই ১৬০টি বুথেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ব্যাপক প্রভাব, না অন্য কোনো কারণ? বিজেপির কি সেই সাংগঠনিক বুনটের অভাব আছে? বলার অপেক্ষা রাখে না ১৬০টি বুথের পরিবেশ নিয়ে সঠিক তথ্য না থাকার জন্য বিজেপিকে বলতে হয়েছে ভোট শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে, কোথাও কোনও পুনর্নির্বাচনেরও প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক ভাবেই এখন আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বা বুথ জ্যাম, ছাপ্পার মতো অভিযোগ আনতে পারছে না। এই ১৬০টি বুথের ভোটের ফলাফল বলছে বিশেষ কিছু এলাকায় তৃণমূল একেবারে প্ল্যান করে ছাপ্পা চালিয়েছে। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় জেলায় ঘুরেছেন দলের লোকেদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন। সেখানে বার্তা দিয়েছেন পঞ্চায়েতে পুরসভায় এত ভালো ফল হলেও লোকসভায় এত খারাপ ফল কেন হয়? এখন ভোট করাতে হবে পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার মতোই। স্বস্তিকাতে ভোটের আগে আমার লেখা নিবন্ধে এই বিষয়টি উঠে এসেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বার্তার সঙ্গে ১৬০টি বুথের ভোটের রেজাল্ট মিলালেই বোঝা যাবে যে তৃণমূল কংগ্রেসের এবার জেতার জন্য নির্বাচনের রণকৌশল কী ছিল। অনেকেই বলতে পারেন তাহলে সেন্ট্রাল ফোর্স কী করছিল? পশ্চিমবঙ্গের অন্তিম দু' দফা অর্থাৎ ৬ দফা ও ৭ দফার নির্বাচনের ঘটনাবলী এবং ডায়মন্ড হারবার মডেল প্রমাণ করে দিয়েছে কীভাবে ভোট করাতে হয়, বিরোধীদের প্রার্থীদের অবাধ যাতায়াত রুদ্ধ করার জন্য জটলা করে গো-ব্যাক স্লোগান দিয়ে তাদেরকে কীভাবে একটি এলাকায় আটকে রাখতে হয়, কীভাবে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কিউআরটির যাতায়াত রুখে দেওয়া যায়, এটা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস প্রমাণ করে দিয়েছে।

কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের এই রিগিং ছাপ্পার প্রমাণের সবচাইতে বড়ো উপায় হলো ভারতীয় জনতা পার্টির হারের ময়নাতদন্ত। এই যে ১৬০টি বুথের কথা বলা হচ্ছে এখানটায় কি বিজেপি সত্যি সত্যিই কোনো পোলিং এজেন্ট ছিল? ভোটের ফলাফল সামনে নিয়ে সাংগঠনিক খোঁজখবর নিলেই স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাবে। আমি নিশ্চিত এই ১৬০ বুথে বিরোধী দলের কোনো এজেন্ট ছিল না বা থাকলেও তারা সক্রিয় ছিল না। তৃণমূল কংগ্রেসের রণকৌশল থেকে এটা পরিষ্কার যে, সমস্ত লোকসভা জুড়ে রিগিং ছাপ্পা চালালে এটা নিয়ে হইচই হবে, অনেক অভিযোগ হবে। তার চাইতে নীরবে প্রত্যন্ত এলাকায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ভোটকেন্দ্রে রিগিং চালালে সেটা প্রকাশ্যে আসার সম্ভাবনা কম। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত লোকসভা কেন্দ্রেই হয়তো এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের রণকৌশল ছিল। যে সমস্ত জায়গায় বিরোধীরা শক্তিশালী ছিল এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুথের সংখ্যা কম ছিল সেই সমস্ত জায়গায় হয়তো এই পরিকল্পনা সফল করতে পারেনি। যেসব জায়গায় সফল হয়েছে তার হিসেব করেই তৃণমূলের প্রত্যাশিত আসনের পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে, সেটাই হয়তো তৃমমূল নেত্রীর আত্মবিশ্বাসের উৎস।

কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে ৩৯টি বুথে তৃণমূলের ভোট ২৩ হাজার ৪৭৯৩টি। সেখানে বিজেপি প্রার্থীর ভোট ১ হাজার ৭৬৯টি। সিতাই বিধানসভায় ৪৫টি বুথে তৃণমূল

প্রার্থীর ভোট ২৮ হাজার ২৫৮টি। সেখানে বিজেপি প্রার্থীর ভোট ২ হাজার ১১৩টি। শীতলকুচি বিধানসভার ৩৪টি বুথে তৃণমূল প্রার্থীর ভোট ২৬ হাজার ৩১০টি। সেখানে বিজেপি প্রার্থী ভোট পেয়েছেন ১ হাজার ৩০৯টি। নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ১৪টি বুথে তৃণমূল প্রার্থী ভোট পেয়েছেন ৯ হাজার ২৮৩টি। সেখানে বিজেপি প্রার্থী ভোট পেয়েছেন ৬২১টি। এই ১৬০টি বুথের ফলাফল সম্পর্কে একটি কথাই বলা যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে ভোট লুটের মেকানিজম তৈরি করা হয়েছিল। এই মেকানিজমের সফল প্রয়োগ তৃণমূল কংগ্রেসকে বলে দিচ্ছিল কোন কোন আসনে ওরা নিশ্চিত ভাবে জয়ী হবে। অন্যান্য আসনেও হয়তো এরকম পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু কোনো কারণে সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি।

তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে প্রত্যেকের একটি ধারণা যে এই দলের কোনো সাংগঠনিক ভিত্তি নেই, নিয়ম শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। তৃণমূল কংগ্রেসকে সাংগঠনিক ভাবে দুর্বল ভাবাতে এর শক্তি সম্পর্কেও বিরোধী দলগুলি যথাযথ ওয়াকিবহাল নয়। সংখ্যালঘু ভোটের ১০০ শতাংশ নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য তৃণমূলনেত্রী সরাসরি সম্প্রদায়িক কার্ড খেলেছেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের সরাসরি আক্রমণ করেছেন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে আক্রমণ করেছেন, মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন কবির হিন্দুদের কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার বক্তব্য রাখার পরেও কোনো প্রতিবাদ করেননি। অধীর চৌধুরীর বক্তব্যেও তৃণমূল নেত্রীর সাম্প্রদায়িক কার্ড খেলার অভিযোগ উঠেছে। অধীর চৌধুরী বলেছেন 'বহরমপুরে নির্বাচনে আমার জয় নিশ্চিত ছিল। রামনবমীর উৎসব পর্যন্ত আমার জয় নিশ্চিত ছিল। মমতা এটা বুঝেছিলেন। সেই জন্যই তার প্রয়োজন ছিল একটি দাঙ্গার।' হ্যাঁ, তৃণমূল কংগ্রেসের সেই অর্থে রাজনৈতিক কর্মী সংখ্যা কম থাকলেও রাজ্যের সমস্ত তোলাবাজ, বালি-পাথর-গোরু পাচারকারী, চাকরি বিক্রির এজেন্টরা সংগঠিত হয়ে তৃণমূলকে জিতিয়েছে। এদের মাধ্যমেই এই ভোট লুটের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি লোকসভা কেন্দ্রে যেখানটাই পেরেছে সেখানেই হিন্দুদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দিয়েছে জেহাদি মুসলমানরা। বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রে আগে থেকেই তাদের এমন শাসানো হয়েছে যে হিন্দুরা ভোটকেন্দ্রে যেতে সাহস পায়নি এমন দৃষ্টান্ত কিন্তু কম নেই। যার ফলে ২০১৯ সালে ৮১.৭৬ শতাংশ ভোট পড়লেও ২০২৪ সালে পড়েছে ৭৯.২৯ শতাংশ। অর্থাৎ এবার ২.৪৭ শতাংশ কম পড়েছে। এদিকে মুসলমান ভোটের ১০০ শতাংশ তৃণমূল কংগ্রেস পেলেও বিজেপির কমিটেড হিন্দু ভোটারদের বুথে যেতে দেওয়া হয়নি। এই ২.৪৭ শতাংশ হিন্দুভোট, আসলে হিন্দু ভোট এই বিশ্লেষণ যুক্তিসিদ্ধ।

সেজন্য পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল যে জনমতের প্রতিফলন নয়, এটা জোর দিয়েই বলা যায়। তৃণমূল পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে যত দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে প্রত্যেকটার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার। দ্রুত তদন্ত ও শাস্তির ব্যবস্থা না হওয়াতে শাসক দল সমস্ত বিষয়গুলোতেই রাজনীতি করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। তাতে বিচার ব্যবস্থা, তদন্ত ব্যবস্থা সমস্ত কিছুর উপরেই মানুষের কতদিন আস্থা থাকবে সে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে যেমন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এমনটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। এবারের লোকসভা নির্বাচন প্রমাণ করে দিয়েছে শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর ভরসা করে পশ্চিমবঙ্গে নিরপেক্ষ নির্বাচন কখনোই সম্ভব নয়। কারণ মানবতার শত্রু বিপজ্জনক শক্তিগুলিই এখন তৃণমূলের ভোটিং মেশিনারি সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। এখানে বিরোধীদলের মজবুত সংগঠন ও নীরব জনসংযোগের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কঠোর নজরদারি ছাড়া জনমতের প্রতিফলন ঘটানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ সমস্ত ব্যবস্থার কিছু ফাঁকফোকর থাকে এখানে ওই সমস্ত ফাঁকফোকরগুলো এমন বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে এর পরেও বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনী কারও পক্ষেই বলিষ্ঠ ভাবে কাজ করা সম্ভব নয়।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধীদের উপর লাগাম ছাড়া সন্ত্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির হাতে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত পুরসভাগুলি জোর করে দখলের খেলায় মেতে উঠেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর সামান্যতম শ্রদ্ধা থাকলে তৃণমূল কংগ্রেস এটা করতো না। কারণ ভোটে মানুষের রায় নিয়েই তো বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনা করছিল।

এখন তৃণমূলনেত্রী হাবেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন নির্বাচনে জিতেছেন মানে তিনি সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থা, তদন্ত ব্যবস্থাকে প্রমাণ করে দিতে হবে যে নির্বাচনে জেতা মানেই দোষমুক্ত হওয়া নয়। জাতীয় নিরাপত্তা আইনে অসমের ডিব্রুগড়ে জেলবন্দি অবস্থায় থেকেই খালিস্তানপন্থী নেতা অমৃতপাল সিংহও এবারের লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।

নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতলেই যদি সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায় তাহলে তো অমৃতপাল সিংহকেও সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত করে দিয়ে সসম্মানে লোকসভায় বসাতে হয়। তৃণমূলনেত্রী নির্বাচনী সভামঞ্চ থেকেই রাজনৈতিক ভাষণ দিয়ে বিচার ব্যবস্থা, তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে পর্যন্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। এটা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাংবিধানিক মর্যাদা বাঁচিয়ে রাখার জন্য আদালতকেও সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। □

আগামীতে আমাদের কিছু কঠিন সত্য নিয়ে সজাগ থাকা প্রয়োজন

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

বিজেপি সমর্থকরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যখন এনডিএ ৪০০ পার করবে এই আশায় বুক বেঁধেছিল তারা, কিন্তু ফল আশানুরূপ হয়নি। বিজেপি ২৪০টা আসন জিতেছে আর এনডিএ ৩০০ সংখ্যার নীচে ২৯৩টি আসনে থেমে গেছে। কংগ্রেসের আসন বেড়ে হয়েছে ৯৯, ইন্ডি জোট ২৩২।

বিজেপি একা সমগ্র ইন্ডি জোটের চেয়ে অনেক বেশি আসন পেয়েছে। বিজেপির আসন কমলেও কংগ্রেস অনেকগুলি আসনে বিজেপির হার নিয়ে বিজয় উৎসব করছে। এটা হাস্যকর, অবাস্তব। আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং তাদের দেশি শাগরেদরা মোদী নিন্দায় অহোরাত্র সরব, তাও তিনি রেকর্ড তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসেছেন, বিশ্বের কোনও নেতাই এটা পারেননি।

তবুও হতাশার কারণ আছে। সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল বিপুল জয় হবে— বিজেপিই বলেছিল যে এনডিএ ৪০০ আসন পেরোবে। তা হয়নি। আবার বিজেপি সমর্থকদের বড়ো অংশ জোট সরকারের অসুবিধার দিকগুলো ভোলেনি— কীভাবে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার পড়েছিল অস্থিরমতি জোটসঙ্গীদের কারণে। তারা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না।

এই ফলের অন্যতম জোরালো কারণ হলো স্থানীয় নেতারা ভোটারদের সঙ্গে সত্যিকারের সংযোগ না করে মোদী ফ্যাক্টরের উপর খুব বেশি নির্ভর করেছিল। অন্য কারণগুলো হলো প্রার্থী চয়নে ভুল, তীব্র গরমে দীর্ঘ সময়ব্যাপী নির্বাচন, দলে অত্যধিক বহিরাগতের আমদানি এবং মূল ভোটার ভিত্তিকে উপেক্ষা করা এবং দেশজুড়ে ৪০ শতাংশ হিন্দুর ভোট না দেওয়া।

যা সম্ভবত বিজেপির আসন সংখ্যা কমিয়েছে তা হলো স্থানীয় ইস্যু। এটা প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় ধরা পড়ে না। লোকসভা নির্বাচন সাধারণত জাতীয় ইস্যুতে হয়, এবার স্থানীয় ইস্যুগুলোও ভোটের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দুটো আলোচনাবিন্দু মাথায় রাখতে হবে।

উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু হিন্দুত্ববাদের সুর ত্যাগ করলে বিজেপির ভাবমূর্তি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রথমত, ভোট সংহত করা বা বিধানসভা ক্ষেত্র অনুসারে বিশ্লেষণ করে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো পর্যাপ্ত ডেটা এখনো প্রকাশিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের কোনও দলে বিজেপির মতো নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা নেই।

অন্য দল থেকে লোক আনা—'ওয়াশিং মেশিন' তত্ত্ব

বিজেপি ১০০টিরও বেশি টিকিট দিয়েছে অন্য দল থেকে আসা ব্যক্তিদের। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রার্থীর অতীত ভালো নয়, যেমন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা কৃপাশঙ্কর সিংহ। ২০১২ সালে মুম্বই কংগ্রেসের প্রধান থাকাকালীন কৃপাশঙ্কর ২৩০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হন। তিনি দিগ্বিজয় সিংহ, মহেশ ভাটের সঙ্গে ২৬/১১ মুম্বই সন্ত্রাসী হামলার জন্য আরএসএস-কে দায়ী করে বই প্রকাশ করেছেন। ২০২১ সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন যদিও দুর্নীতির মামলাগুলো চালু ছিল। আরও কয়েকজন দাগি নেতা ছিলেন, যারা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত। এবং অন্যরা অতীতে ভয়ানক অপরাধী ছিলেন, যারা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। কৃপাশঙ্কর সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর থেকে বিজেপির টিকিটে লড়ে প্রায় ১ লক্ষ ভোটে এসপির কাছে হেরেছেন। ২০১৯-এ বিএসপি এই আসনে জিতেছিল। এই নির্বাচনে এসসি ভোট স্পষ্টত বিএসপি থেকে সরাসরি এসপি-তে গিয়েছে।

২০১৪-তে যখন বিজেপি জিতেছিল, তখন তিনটি জোরালো ইস্যু বিজেপির জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছিল--- উন্নয়ন, দুর্নীতিদমন এবং হিন্দুত্ব।

প্রশ্নাতীতভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত ও হিন্দু-বিরোধীদের দলে আগমনে পার্টির ভাবমূর্তি সামগ্রিক ক্ষতি হয়। লোকে জিজ্ঞাসা করে যে বিজেপি কংগ্রেস বা সমাজবাদী পার্টি থেকে কীসে আলাদা? স্থানীয় ক্যাডারদের বিতৃষ্ণা বেড়ে যায়। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ও কূটকৌশলের যুক্তি দিয়ে দলবদলুদের নেওয়ার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেছে দল। সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের নেতারা বলেছিলেন যে, জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে দুর্নীতিবাজ এবং হিন্দু-বিরোধীদের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে— নির্বাচনে জেতা খুব দরকার। বিজেপিকে দেশবিরোধী গ্যাংকে হারিয়ে ক্ষমতায় থাকতে হবে, কিন্তু রাজনৈতিক সুবিধা যদি মৌলিক মূল্যবোধ নষ্ট করে তখন আদি সমর্থকরা নীরবে ক্ষুব্ধ হন। নির্মলা সীতারামন বলেছিলেন যে প্রত্যেকেরই বিজেপিতে যোগদানের স্বাধীনতা আছে, আদি সমর্থকদের উদ্বেগ উড়িয়ে এমন বিবৃতি দলের পক্ষে ভালো হয়নি। যে দল দাবি করে যে অন্য দলের মতো তারা নয়, আদি সমর্থন ভিত্তির সঙ্গে সেই দলের সংযোগ থাকা উচিত।

ভুল বিবৃতি

রাজনীতিতে কথা ও কাজ সমান গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কেউ বলেন যে রাজনীতিতে যা করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যা বলা হয়। এই সত্যের নিরিখে বিজেপি নেতাদের বেশ কিছু বিবৃতি আদি সমর্থকদের বিশ্বাসভঙ্গ করেছিল। জেপি নাড্ডা ২০২৪-এর মার্চে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে কাশী ও মথুরায় মন্দির নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা নেই।

তাঁর মন্তব্য অনুযায়ী— 'বিজেপির এমন কোনও ধারণা, পরিকল্পনা বা ইচ্ছা নেই। সেখানেও কোনো আলোচনা নেই। আমাদের সিস্টেম এমনভাবে কাজ করে যেখানে পার্টির চিন্তা, প্রক্রিয়া সংসদীয় বোর্ডে আলোচনার মাধ্যমে বানানো হয়, তারপর তা জাতীয় পরিষদে যায় ও সেখানে তা অনুমোদন করা হয়। তিনি বলেন নরেন্দ্র মোদী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে দলের ফোকাস হবে দরিদ্র, শোষিত, দলিত, নারী, যুবক, কৃষক এবং সমাজের প্রান্তিক অংশ। এই শ্রেণীগুলিকে সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত ও সশক্তিকরণ করা উচিত'। মন্দির নির্মাণ বিষয়ে যোগীজী এবং হিমন্ত বিশ্বশর্মার বক্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জেপি নাড্ডা বলেন, 'কোনো অস্পষ্টতা নেই। বিজেপি তার পালমপুর রেজোলিউশনে (জুন ১৯৮৯) রাম মন্দিরের দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। দীর্ঘ সংগ্রামের পর মন্দির বাস্তব আকার নেয়। এটা আমাদের অ্যাজেন্ডায় ছিল। কিছু মানুষ আবেগপ্রবণ বা উত্তেজিত হয়ে অন্যান্য বিষয়ে কথা বলে। আমাদের বড়ো দল, প্রত্যেক নেতার কথা বলার আলাদা ভঙ্গি থাকে। বিজেপি স্বনির্ভর হয়েছে, এর কাজকর্মের জন্য আরএসএস-এর প্রয়োজন নেই। দুই সংস্থার মধ্যে অপরিসীম শ্রদ্ধা আছে। আরএসএস সাংস্কৃতিক সংগঠন আর বিজেপি রাজনৈতিক সংগঠন। প্রত্যেকেরই নিজস্ব কাজ আছে। শুরুতে আমরা কম সক্ষম, ছোটো দল ছিলাম এবং আরএসএসের প্রয়োজন হতো। আজ আমরা বেড়েছি এবং আমরা সক্ষম। বিজেপি নিজেকে নিজেই চালাতে পারে।'

বিজেপি ভাবতে ভালোবাসে যে শুধু উন্নয়ন নিশ্চিত করলেই তাদের দল অটুট থাকবে, কিন্তু এতে শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রকৃত কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে। এটা প্রায়শই বিভিন্ন ইস্যুতে ঘটে। উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু হিন্দুত্ববাদের সুর ত্যাগ করলে বিজেপির ভাবমূর্তি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই বিবৃতিগুলো ইঙ্গিত দেয় যে বিজেপি হিন্দুত্বের অভিমুখ ত্যাগ করছে। তারা কেবল বলে যে দল রামমন্দির নির্মাণ করেছে। কলঙ্ক অপনোদনের পক্ষে এটা যথেষ্ট নয়, কারণ মোহভঙ্গ অনুরাগীরা বলেন যে বিজেপি মন্দিরের জন্য কোনো আদেশ দেয়নি বরং সুপ্রিম কোর্ট সেই নির্দেশ দিয়েছে।

নিজের সমর্থক-কর্মীদের পাশে দাঁড়ায় না

২০২২-এ কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলায় বিজেপির যুব মোর্চা জেলা কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্য প্রবীণ নেত্তারুকে পিএফআই জিহাদিরা নির্দয়ভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছে। হত্যা এবং এর নিছক বর্বরতা হিন্দুদের ক্ষোভে উত্তাল করে। তারপরে কর্ণাটকে যা ঘটেছিল তা বিজেপির চোখেই নজিরবিহীন। কর্ণাটকের বিজেপি কর্মীরা রাস্তায় নামলেও বিজেপি নিজে কর্মীদেরকে রক্ষার কোনো ব্যবস্থা করেইনি। দলের রাজ্য প্রধান নলিন কুমার কাতিল-সহ অন্যান্য নেতা ও বিধায়কদের বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করা হয়।

দল দোষীদের শাস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। প্রবীণ নেত্তারু হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এগিয়েছে। পিএফআই শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু কর্মীদের রক্ষা না করায় তারা দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করল কেন? এটা সত্য যে বিজেপি কর্মী এবং হিন্দুত্ববাদী নেতারা ক্রমবর্ধমান আক্রমণের শিকার হয়েছে, বিজেপি নিজেদের লোকদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্তত প্রকাশ্যে তাই। জিহাদি হামলার হুমকি এবং ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে ওঠা বামপন্থীদের বিষয়টা বিজেপির তরফে তড়িঘড়ি চাপা দেওয়া হয়েছে। জিহাদিরা শিরশ্ছেদ করলে বামেরা তার সাফাই দেয়। জিহাদি হামলার দোহাই দেয় বামপন্থীরা এই বলে যে হিন্দুদের আক্রমণ করা দরকার। বিজেপি বেশিরভাগ সময় গভীর ঘুমে থাকে। তারা ফ্যাসিবাদী নন তা প্রমাণ করার চেষ্টায় সম্ভবত এতটাই ব্যস্ত যে তাদের সেই আত্মতুষ্টি তাদের সমর্থকদের কাছে একধরনের নিরপেক্ষতায় পরিণত হয়েছে।

প্রবীণ নেত্তারু হত্যার ঠিক আগে, ২০২১-এর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা হয়েছিল। হিংসার সময় এবং পরে বিজেপি নেতাদের সত্যিকার অর্থে কোথাও দেখা যায়নি। স্থানীয় নেতারা কর্মীদের ত্যাগ করেছিলেন। দলীয় নেতৃত্ব কেন কর্মীদের বাঁচাতে ব্যর্থ— এই ধরনের প্রশ্ন ও বিষয়গুলি যে বা যারা তুলেছে, তারা দলীয় নেতৃত্বের ওপর

আস্থাশীল নয় বলে প্রচার করা হয়েছে।

এরপরে নূপুর শর্মা মামলা দলের জন্য আরও কিছুটা ক্ষতি করে। দল থেকে নূপুরের বরখাস্ত হওয়া ইঙ্গিত দেয় যে পার্টি তার নিজের লোকদের দমাতে চায়, ন্যায়বিচার প্রয়োজন নেই। তারা সেই শক্তিকেই বৈধতা দিয়েছিল যারা প্রবীণ নেত্তারুকে হত্যা করেছিল এবং নূপুরকে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল। আজ পর্যন্ত নূপুরকে দলে ফিরিয়ে আনা হয়নি। সরকার তাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে এবং তাকে নিরাপদ রাখা নিশ্চিত করছে। এটা কি যথেষ্ট? আসলে তা নয়।

এরকম বেশ কিছু ঘটনা আছে উদাহরণস্বরূপ, টুইটার হ্যান্ডেল 'ট্রু ইন্ডোলজি'তে জ্যোতিবা ফুলের ইতিহাসের মূল্যায়ন বেরনোর পরে দেবেন্দ্র ফড়নবীসের বিবৃতি। দল ক্রমাগত ইঙ্গিত দেয় যে তাদের বিশেষ কোনো সমর্থকদের প্রয়োজন নেই এবং তাই যখন তারা সমস্যায় পড়ে তখন তাদের জীবন দলের নির্বাচনী স্বার্থের চেয়ে সস্তা। এতে কি ২০২৪-এ বিজেপি ভোট খোয়াতে হয়েছে? নিশ্চিত নয়, কেউ তবে এটা দলের ভাবমূর্তি এবং সমর্থকদের ভয়ানক ক্ষতি করেছে সন্দেহ নেই।

রাস্তার রাজনীতির কাছে দল মাথা নুইয়েছে

ক্ষমতায় আসার সময়ে বিজেপিকে এমন এক দল হিসেবে দেখা হয়েছিল যারা রাষ্ট্রহিত কার্যকর করতে ভয় পায় না। বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্তের কারণে এই ভাবমূর্তি গুরুতর মার খেয়েছে যেখানে তারা রাস্তার হিংসাত্মক আন্দোলনের সামনে নতজানু হয়েছিল। যখন খালিস্তানিরা ভারতীয় পতাকা ছিঁড়ে লোকদের হত্যা করে, তখন প্রত্যাশা ছিল যে কোটি কোটি কৃষকদের উপকার করার জন্য ভালো কৃষি আইন প্রত্যাহৃত হবে না। সমর্থকরা আশা করেছিল যে সরকার দেশবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর হবে। পুলিশকে বিক্ষোভকারীরা নির্দয় মারধর করেছিল এবং প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এরপর আত্মসমর্পণের নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে কৃষিবিল প্রত্যাহৃত হয়।

দিল্লির দাঙ্গা এর থেকে কিছু ভালো নয়। যখন শাহিনবাগে বিক্ষোভ হচ্ছিল পরিষ্কার জিহাদি সুরে, তখন সরকার কিছুই করেনি। এরপর যখন হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রতিদিন হিংসা ও সন্ত্রাস চলছিল, তখন সরকার কিছুই করেনি। তারপরেও যখন দিল্লিতে হিন্দু-বিরোধী হিংসা ঘটেছিল, তখন সরকার তৎপরতার সঙ্গে ৩ দিনের মধ্যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু পুলিশকে কোনো বলপ্রয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

সিএএ রূপায়ণে বিলম্ব আবারও বুঝিয়ে দিয়েছে যে সরকার আবার রাস্তায় আন্দোলনকারী জনতাকে ভয় পেয়েছিল। আমাদের বারবার বলা হয়েছিল যে কোভিডের কারণে দেরি হচ্ছে, কিন্তু কেউ সেই আখ্যান মানেনি।

এই ধরনের বেশ কিছু ক্ষুদ্র স্তরের ভুলভ্রান্তি উপেক্ষিত অথবা সমাধান করা হয়নি। যে দল শক্তিশালী বলে গর্ব করে এরকম বেশ কিছু উদাহরণ সেই ছবিটাকে বেআব্রু করেছে। পুলিশ শাহিনবাগ আন্দোলনকারীদের বলপূর্বক তুলে দেয়নি, কারণ মহিলাদের সামনে এগিয়ে রাখা হয়েছিল। বারবার এই ধরনের দৃষ্টান্ত একটা চেনা ছক হয়ে ওঠে এবং বোঝায় যে বিজেপি আইনের আদেশ কার্যকর করার কথা বলবে কিন্তু যখন জনতা রাস্তায় নামবে তখন তারা গুটিয়ে যাবে।

হিন্দু সমস্যা উপেক্ষিত হয়েছে

জনপ্রিয় দাবি এই যে শুধুমাত্র উন্নয়ন বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছে। নির্বাচনী রাজনীতি বাদ দিলেও 'হিন্দুত্ব মতাদর্শ কোনো ভূমিকা পালন করেনি' দাবি করা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। আমরা কখনই জানতে পারি না যে বিজেপি উন্নয়নের জন্য কত ভোট পায় এবং হিন্দুত্ব ইস্যুতে কত পায়। হিন্দুত্ব বিজেপির অন্যতম কেন্দ্রীয় লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী গোরক্ষকদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন। সেই সময়ে সমর্থকদের বেশিরভাগই বিরক্ত, ক্ষুব্ধ ছিল, তবে তেমন সমালোচনা করা হয়নি, কারণ বিশ্বাস করা হয়েছিল যে বিজেপি হিন্দুত্বের প্রতিনিধি। এই ধরনের বিবৃতি কেবল রাজনৈতিক কৌশলের কারণে করা হচ্ছে। কিন্তু হিন্দুদের বিরুদ্ধে হামলা নিয়ে কোনো বিবৃতি আসেনি। ২০১৯ সাল নাগাদ লোকসভায় জয়ের পরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হিংসা ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। হাউজ খসের ঘটনা থেকে শুরু করে মিথ্যা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেওয়ার অপরাধ, মন্দির ও ধর্মীয় শোভাযাত্রার বিরুদ্ধে হামলা, কমলেশ তিওয়ারি হত্যা এবং দিল্লির সিএএ-বিরোধী আন্দোলন সবেতেই হিন্দুরা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু।

সবাই আশা করেছিল পার্টির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা কথা বলবেন— কারণ বিজেপি হিন্দুত্ববাদী। যখন নূপুর শর্মা ঘটনা থেকে কানহাইয়ালালকে হত্যার ঘটনা ঘটেছিল তখন কোনো মন্তব্য শীর্ষনেতৃত্ব থেকে আসেনি দুই বছর ধরে। রাজস্থানে নির্বাচনের আগে এক নির্বাচনী সমাবেশে তার বিরুদ্ধে বিবৃতি এসেছে। অনেকের কাছে এটা হিন্দুমৃত্যুকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার করুণ রাজনীতি মনে হয়েছে।

পাসমান্দা মুসলমানদের কাছে টানতে গিয়ে হিন্দুরা উপেক্ষিত হয়েছে। যুক্তি দেওয়া হয় যে বিজেপি রামমন্দির তৈরি করেছে। রামমন্দির বিজেপির আমলে নির্মিত হয়েছে, কিন্তু এটা দিয়ে হিন্দু ইস্যুতে অন্যান্য ত্রুটিকে মেনে নেওয়া যায় না। আরেকটি প্রশ্ন, কী করে সমর্থকরা দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের তুলনায় হিন্দুদের সম্পর্কে বেশি যত্নশীল হওয়ার দাবি করতে পারে? ◻

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

সরসঙ্ঘচালকজীর বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে সবাইকে ভাবতে হবে

আনন্দ মোহন দাস

সম্প্রতি নাগপুরে কার্যকর্তা বিকাশ বর্গের সমাপ্তি সমারোহে স্বয়ংসেবকদের সামনে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের ভাষণে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং সুশীল সমাজকে আলোড়িত করেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হলেও সমাজ ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে মতামত ব্যক্ত করে থাকে। সঙ্ঘ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকারের প্রশাসনিক নীতি এবং তার ভূমিকার ওপর নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। সেজন্য সরসঙ্ঘচালক সরকারের উদ্দেশে সময় সময় সঙ্ঘের মনোভাব মানুষের সামনে ব্যক্ত করে থাকেন। তিনি সদ্য অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচন, সরকার গঠন এবং মণিপুর সমস্যা নিয়ে অতি মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। এবারের নির্বাচনী প্রচার সম্পর্কিত বক্তব্যে তিনি নির্বাচনী ভাষণে সমস্ত রাজনৈতিক দলের শালীনতা ও মর্যাদা বজায় রাখার পক্ষে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নির্বাচনী রাজনীতিতে ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী দল থাকাই স্বাভাবিক। তাদের 'বিরোধী' শব্দ প্রয়োগ না করে 'প্রতিপক্ষ' বলা উচিত। তাদের বিরোধী না ভেবে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবা উচিত। গণতন্ত্রে সবাই এক মতাদর্শে বিশ্বাসী হবেন তা আশা করা বৃথা। উভয়ের ভূমিকা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। গণতন্ত্রে শাসক ও বিরোধী উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য বিরোধীদের শত্রু না ভেবে আলোচনার মাধ্যমে, সকলের সহমতে শাসন পরিচালনা করাই আদর্শ সরকারের লক্ষণ। অর্থাৎ তিনি সংসদে ডিবেট, ডিসকাশন ও ডিসিশনের কথা বলেছেন।

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিপক্ষের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং তাদের শত্রু না ভেবে দেশের স্বার্থে সহমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই আদর্শ শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ বলে তিনি উল্লেখ করেন। অবশ্য তিনি একথাও বলেছেন, গণতন্ত্রে একশো শতাংশ সহমত হওয়া খুব কঠিন বিষয়।

তিনি প্রকৃত সেবকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, সেবককে অহংকার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ না হয়ে মর্যাদার মধ্যে থাকতে হবে। সবকিছু আমি করেছি— এই মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। আত্মপ্রচার বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ তিনি গীতায় উক্ত অনহংবাদী হবার কথা বলেছেন। আমিত্ব ত্যাগ করার কথা বলেছেন। কার্যকর্তাকে মানুষের সেবায় বিনয়ী ও নম্র হতে হবে। তিনি শক্তিসম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রবান হওয়ার কথা বলেছেন। কারণ অনেক সময় কার্যকর্তারা আত্মসন্তুষ্টি ও মিথ্যা অহংকারে ভোগেন। রাজনীতিতে ব্যক্তি নয়, মতাদর্শ ও দলকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কারণ ব্যক্তি আজ আছে, কাল নেই।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সরসঙ্ঘচালক সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের প্রেক্ষিতেই বিজেপির উদ্দেশ্যেই এই কথাগুলি বলেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্যে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বিশ্বে ভারতের সম্মান বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু তিনি মণিপুর সম্পর্কে বলেছেন, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা যে বিগত একবছর ব্যাপী মণিপুরে শান্তির প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও হিংসা থামছে না। বিগত দশ বছরের বেশি সময় মণিপুরে শান্তি বিরাজ করত। গত সপ্তাহে জিরিবামে নতুন করে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের ওপর যে সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে, তা অভাবনীয় এবং এক অশনিসংকেত। সৌভাগ্যক্রমে মুখ্যমন্ত্রী সেই কনভয়ে না থাকায় তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। গত একবছরের বেশি সময় ধরে মণিপুরে হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটে চলেছে। তারফলে বহু মানুষ প্রাণ হরিয়েছেন। সন্ত্রাসের ভয়ে বহু মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। কোনোভাবেই অশান্তি থামছে না। সরসঙ্ঘচালকজী মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে উদ্যোগী হতে বলেছেন। বর্তমানে মণিপুরে যে হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বা করানো হয়েছে সে বিষয়ে সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও সরসঙ্ঘচালকজী বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সামনে স্ব-আধারিত জীবন নির্মাণ, পরিবেশ রক্ষা, বৃক্ষরোপণ, জল সংরক্ষণ, প্লাস্টিক বর্জন, সামাজিক সদভাবনা এবং পরিবার প্রবোধনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন। □

হিন্দুদের জমি জবরদখলে বাংলাদেশ সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

দেশবিভাগ, নোয়াখালির হিন্দু নরসংহার, ঊনসত্তরের গণআন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, বিরানব্বইয়ে সামরিক সরকারের সময় ভারতে বাবরি ধাঁচা অপসারণ ইত্যাদি গত দেড়শো বছরে সংঘটিত স্থানীয় ও সরকারি ছোটো-বড়ো সংঘাতের ফলে বাংলাদেশের হিন্দু জনসমাজ যথেষ্ট শঙ্কিত এবং দেশটির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। প্রতিটি ঘটনার পর হিন্দুদেরই তার প্রতিফল ভুগতে বাধ্য করা হচ্ছে। বিশ্বাস হারিয়ে হিন্দুরা নিজেদের সহায় সম্বল ফেলে শুধু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করছে। ভোটের সময় হিন্দুদের ভোট পাবার আশায় সবরকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া দেশটির একটি রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। নির্বাচন শেষে সবাই ওই প্রতিশ্রুতি বেলালুম ভুলে যায়। বাস্তবায়নের প্রয়োজনও মনে করে না। ফলে এপর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলই হিন্দুদের বিশ্বাস অর্জনে সমর্থ হতে পারেনি। প্রতিনিয়ত হিংসা এবং কারণে-অকারণে হিন্দুদের ওপরে অত্যাচারের ফলে নিজ জন্মভূমি ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে হিন্দুরা। জনশ্রুতি, বর্তমান সরকারের আমলেই রেকর্ড সংখ্যক হিন্দুদের জমি জবরদখল হয়েছে। এখনো প্রায় প্রতিদিন বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও হিন্দুদের সম্পত্তি ও সম্পদ বেহাত হয়ে যাচ্ছে। হিন্দুদের জমিজায়গা কেড়ে নেওয়া বাংলাদেশের একটা অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে গত ১৩ জুন একজন সাংসদ সংসদে জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, বাংলাদেশ অর্পিত সম্পত্তির ‘ক’ ও ‘খ’

তালিকাভুক্ত কত পরিমাণ জমি প্রকৃত মালিকদের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে? উত্তরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ওই সাংসদকে জানান, ‘ক’ তালিকাভুক্ত ১লক্ষ ১৪ হাজার ৩১০টি মামলার রায় হয়েছে। যার মধ্যে মাত্র ১৪ হাজার ৭১৫টি মামলার রায় ভুক্তভোগীদের পক্ষে গিয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, বাকি সবকটি মামলার রায় জবরদখলকারীদের পক্ষেই গেছে। এখানে গোপন সত্যটা হলো, জবরদখলকারীদের প্রায় সবাই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা, মন্ত্রী, এমপি কিংবা সরকারের উচ্চপদস্থ আমলা বা প্রশাসক। বিচারকদের বিচার প্রক্রিয়া নিয়েও বহু প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু উত্তর দেবে কে?

কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করলে এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। কুমিল্লার বিখ্যাত দাতব্য প্রতিষ্ঠান মহেশাঙ্গনের জমি, ত্রিপুরার রাজা বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের কান্দির পারস্থ বীরচন্দ্র পাঠাগারের ভূমি, নোয়াখালির গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের জমি, ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের জমি—এমন হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানের জমি নেতা-মন্ত্রীরা বিভিন্ন কৌশলে হাতিয়ে নিয়ে জাল দলিল, পরচা তৈরি করে বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান বানিয়েছেন। এইসব জমিতে বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রী, এমপি বা প্রভাবশালী নেতার ছবি টাঙ্গিয়ে রাখার কৌশল করা হয়। আদালতের সামনে দাঁড়ালে হাজার হাজার জমিহারা মালিকের বুকফাটা কান্না সবাই শুনতে পায়।

সংসদে আরও জানানো হয়, ‘খ’ তালিকাভুক্ত মোট মামলার সংখ্যা ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৯৮টি। এর মধ্যে ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮৪১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত এইসব মামলার জমির পরিমাণ ২,৫৩,২০৮.০৭ একর। আসল সত্য হলো, এই যে লক্ষ লক্ষ জমিহারা, যারা তাদের জমির দাবি করতেই পারেন নাই। দাবি করার মতো তাদের অবস্থাও নাই। সংসদে প্রশ্ন উঠছে, তবু কেউ ক্ষমতার জোরে, কেউ ভয় দেখিয়ে, কেউ জাল দলিল তৈরি করে, কেউ ধর্মের দোহাই দিয়ে হিন্দুদের জমি দখল করেই চলেছে।

আরও কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপন করা প্রাসঙ্গিক হবে। ঢাকার উত্তরার বিরুলিয়া, যেখানে বর্তমানে একটি বাসস্ট্যান্ড রয়েছে, ঠিক সেখানেই দ্বিগুণ মৌজার অন্তর্গত প্রায় একশো বিঘা জমি প্রকৃত মালিকের হাতছাড়া হয়েছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর ছবি টাঙ্গিয়ে ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ সংগঠনের একটি সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে একটি স্টুডিয়ো তৈরি করা হয়েছে। তারই সঙ্গে আরও কয়েকজন প্রভাবশালী কাশ্মীরি গার্ডেন নামে একটি বিশাল পিকনিক স্পট তৈরি করেছেন।

একই মালিকের অন্য জমিগুলিও এভাবেই দখল করা হচ্ছে। সংবাদসূত্রে জানা গেছে, প্রকৃত মালিকের হাতে জমির দলিল থাকা সত্ত্বেও মামলা ধীর লয়ে চলছে। এরকম আরও বহু প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়। আসলে সরকারের ভাবমূর্তিই স্পষ্ট নয়। সে কারণেই দখলদাররা আশকারা পেয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরাও এই অনাচারের বিরুদ্ধে চুপ করে রয়েছেন। □

রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলকে বাস্তবের মুখোমুখি হতে হবে

রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দল সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে প্রত্যাশিত ফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে গত ১০ বছরে যা যা করার দরকার ছিল তাতে বেশ কিছু খামতি আছে। প্রথমত লোকসভা নির্বাচনে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দল তার মূল অ্যাজেন্ডা হিন্দুত্ব থেকে অনেকটাই নরম পথে চলার জন্য অনেকে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। একটু পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে হিন্দুত্ববাদীদের একাংশ রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের থেকে সরে গিয়ে নোটায় বোতাম টিপেছে। হিন্দুত্ববাদ ভারতের চিরন্তন শাশ্বত সত্য। এই শব্দটিকে এবারের নির্বাচনে রাষ্ট্রবাদী দল ব্যাপক হারে প্রচার করতে ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রীবাদী ব্যক্তিদের আরও বেশি করে দেশের সমস্ত লোকসভা আসনে প্রার্থী করা উচিত ছিল। কিন্তু কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে সেটা সম্ভব না হওয়ার কারণে এই বিপর্যয়। একথা মনে রাখা প্রয়োজন, রাষ্ট্রীবাদী ব্যক্তিদেরই দেশের মানুষ নিজেদের আত্মার আত্মীয় বলেই মনে করে। আর সেই কারণেই রাষ্ট্রবাদী দলের সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও এই উত্থান সম্ভব হয়েছে। যদিও নেতৃত্বের কিছু ভুল সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গে তাদের ১৮ থেকে ১২-তে নামিয়ে এনেছে। অর্থাৎ এক ডজন সংসদ নিয়েই পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। একথা প্রমাণিত সত্য যে, বিগত লোকসভা নির্বাচনে রাষ্ট্রবাদী দলের ১৮ জন সংসদ সদস্য ছিলেন। কিন্তু এই ১৮ জন সংসদের বেশিরভাগই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীতে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের দূরত্ব ছিল কয়েক আলোকবর্ষের। রাষ্ট্রবাদী সরকারের জনকল্যাণমুখী কার্যক্রম সাধারণ মানুষের সামনে আনতে এবং তার বাস্তবতাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাশাপাশি একটি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা কখনোই সম্ভব নয়, তা হলো দীর্ঘ ১০ বছর কেন্দ্রীয় সরকারে থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রবাদী দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সুযোগ সুবিধার ছিটেফোঁটা বণ্টিত হয়নি। তাই দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও তার প্রত্যুত্তর ইভিএমে দিয়েছে। এই বাস্তবতাকে রাষ্ট্রবাদী দলকে স্বীকার করতেই হবে।

ক্ষমতায় আসার আগেই রাষ্ট্রবাদী দলের বিভিন্ন জেলাতে এবং মণ্ডলে আদি ও নব্য— এই দুটির জোড়া চোরাস্রোত সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে। রাষ্ট্রবাদী দলের অনেক পুরনো কর্মীকে উপেক্ষিত রাখাটাই একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজের লোক নয়, কাছের লোক প্রাধান্য পেয়েছে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ একই ছবি বারবার উঠে এসেছে। নির্বাচন পরিচালনায় অর্থের সঠিক ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রবাদী দলকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কাজের লোকদেরকেই প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন যোগ্যতা অনুসারে সাম্মানিক বেতনের বিনিময়ে যোগ্য কর্মীদেরকে দলের বেতনভুক্ত কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা।

উপরোক্ত ভুলত্রুটি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রবাদী দলকে উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। তবেই আগামীতে সফলতা আসা সম্ভব।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
কলেজ রোড, বনগাঁ উ: ২৪ পরগনা।

নির্বচনে জয়-পরাজয় এবং পশ্চিমবঙ্গ

সংখ্যাগুরুর সঙ্গে সংখ্যালঘুদের সমান করে দাঁড়িপাল্লায় কখনো মাপা যায় না যতই ধর্মনিরপেক্ষতার মলম লাগানো হোক না কেন। মিথ্যার বেসাতি দিয়ে কাউকে কখনো এক করা যায় না। এবার নির্বাচন উন্নয়নের সঙ্গে দুর্নীতির লড়াই বলা যায়। যত বেশি করে হিন্দুদের উপর বিষোদ্গার হয়েছে তত বেশি হিন্দুরা একজোট হয়ে ইভিএমের মেশিনে পদ্মফুলের বোতাম টিপেছে। তাই টানা তিনবার নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। যদি পশ্চিমবঙ্গে এই নির্বাচনের মহানায়িকা বসিরহাটের রেখা পাত্র হন, তাহলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্তিক মহারাজা হবেন মহানায়ক, কারণ এই দুজন মানুষের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদিও রেখা পাত্র এই নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, মঠ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইসকন-সহ হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে তৃণমূল ভোট মেরুকরণ করতে সফল হয়েছে। মুর্শিদাবাদে এমএলএ হুমায়ুন কবিরের হুমকি ছিল, তিনি সেখানকার হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেবেন, যার ফলে মুসলমানদের ভোট তৃণমূলের ভোটবাক্সে টানতে সফল হয়েছেন।

এই নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ এক এক করে খুলে পড়েছে। সিপিএমের প্রধান কাজ হিন্দুদের ভোট কেটে তৃণমূলকে জিতিয়ে দেওয়া। একদিকে দাস নরেন্দ্র মোদী যখন কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ শিলায় ধ্যানমগ্ন, অন্যদিকে তখন আপাদমস্তক দুর্নীতিবাজ কিছু নেতা-নেত্রী রণে তুঙ্গে থেকেছে। দুটো চরিত্র খুব পরিষ্কার হয়ে মানুষের চোখে ধরা দিয়েছে। একদিকে মনে হয় নতুন ভোর, অন্যদিকে তমাসাচ্ছন্ন আঁধারে ভরা।

একজন তাঁদের নির্বাচনী সংকল্পে যা যা বলেছেন তা তাঁরা পূরণ করতে সফল হয়েছেন। অন্যদিকে শুধু ভাঁওতাবাজি। এই নির্বাচনে জনগণ সঠিক দল বিজেপি এবং তার জোট দল এনডিএ-কে ভোট দিয়ে তাদের দায়িত্ব, দেশের প্রতি কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেছেন। তাঁদের রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন যা আসমুদ্র

ফঃ ৩

হিমাচল সবার ভালোলাগার কথা। নির্বাচন মানে সন্ত্রাস নয়। ক্ষমতা মানে দুর্নীতি নয়। সকলেই স্বপ্ন দেখে, নির্বাচনের নামে কাটাকাটি, হানাহানি থাকবে না। এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে একতরফা ভোট মেরুকরণ হয়েছে একথা জোর দিয়ে বলা যায়। কংগ্রেস প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরীর পরাজয়ের কথা বলা যায়। মুসলমান ভোট তৃণমূলের পক্ষে গেছে। তাই তাঁর পরাজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে হিন্দুরা ডিভাইডেড বাই পলিটিক্স এবং মুসলমানরা ইউনাইটেড বাই রিলিজিয়ন। পশ্চিমবঙ্গে একটাও মুসলমান প্রার্থী ছিল না বিজেপির। ছিল সিএএ-র ভয়। রামমন্দির নির্মাণ নিংসন্দেহ একটা ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছিল। উত্তর প্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে তার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে নির্বাচনে। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতৃত্বের বোঝাপড়ার অভাব, সঠিক প্রার্থী বাছাই, প্রার্থীদের কেন্দ্র বদল, প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে দেরি করা ইত্যাদি জনমানসে ছাপ পড়েছে। সর্বোপরি, পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব এরাজ্যের নেতা-নেত্রীদের হাতে দিতে হবে। এই নির্বাচন কিন্তু জনগণের সঠিক প্রতিফলন বলা যায় না। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সঠিক ছিল না আমাদের পশ্চিমবঙ্গে। এরাজ্যে পাঠানো কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিন্দাজনক বলা যায়। সিপিএম এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে, ৪২-এ তারা শুধু শূন্য। কেবল শুনেছি তাদের গলাবাজি। এবারে এক্সিট পোলের সমীক্ষা জনগণকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। গলাবাজির মতো সংখ্যাবাজি আমাদের অবাক করেছে। কোনো এক্সিট পোল মেলেনি। সেই সঙ্গে মেলেনি ভোট বিশারদ প্রশান্ত কিশোরের ভবিষ্যদ্‌বাণী। তবে শেষ কথা একমাত্র জনগণই বলতে পারেন। এনডিএ জোট তাদের সংকল্পপত্রে যা বলেছে সেগুলো অবশ্যই পূরণ করবে এই প্রত্যাশা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

সম্মুখ সমরে দুই জোট

ইন্ডি জোট ভাবছে এই সুযোগ। এই সুযোগ যেন হাতছাড়া না হয়। একবার হাত ছাড়া হলে হয়তো এ জীবনে নরেন্দ্র মোদীকে জব্দ করা যাবে না। তাই তারা কোমর বেঁধেছে। দেশজুড়ে এমন একটা ন্যারেটিভ তৈরি করছে, 'দেশ মোদীকে সরকার গঠন করতে সুযোগ দেয়নি।' যে যেমন তার বিচার, তার ভাবনাও ঠিক তেমনি। এটা ইন্ডি জোটের চেহারা দেখলেই পরিস্কার। অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ছে। তখন আমি অফিসে বাসে করে যাতায়াত করতাম। হাওড়া স্টেশনে বাস ছাড়ার আগে একটা খালি সিট পেয়ে বসে ছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম সামনের দরজায় পাশে বসে এক গ্রামীণ মহিলা দাঁড়িয়ে বাসের ভিতরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করা এক যুবককে তার টাকা ফেরত দিতে বলছিল। মহিলা তাকে বলছিল তার পকেটেই ওর টাকা আছে। সব দশ টাকার নোট। এরপর ওই মহিলা বাসের লোকেদের একটু দেখার জন্য অনুরোধ করলে আমি ভালো করে নজর করতেই কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ল। একটু ধমক দিতেই দশ টাকার সব নোট বেরিয়ে এলো। মহিলা জানায়, ওখানে তিনশো টাকা আছে। সবার সামনে গুনে দেখলাম ঠিক তাই। টাকা হাতে নিয়ে প্রথমেই যুবককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এতে কত টাকা আছে। যুবকটি উত্তর দেয়নি। অগত্যা যার টাকা তাকে দিয়ে দিলাম। এরপর যুবককে দু'চার ঘা দিতেই সে বাস থেকে নেমে পালিয়ে গেল। এটা একটা ঘটনা। একটা অসংগতি চিহ্নিত করে দিল বাস্তবটা।

ইন্ডি জোটের শরিকদের দেখলেই নানান অসঙ্গতি চোখে পড়বে। সঙ্গে চোখে পড়বে সবার মিল। ওদের অসঙ্গতি (১) কেন্দ্রীয় স্তরে মিল থাকলেও রাজ্যে বিরোধ। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও সিপিআইএম-এর সঙ্গে হয়নি ইন্ডি জোট। কেরালায় হয়নি কংগ্রেস ও সিপিআইএম-এর ইন্ডি জোট। পঞ্জাবে হয়নি আপ কংগ্রেসের ইন্ডি জোট। ভোট পরবর্তীকালে দিল্লিতে আপ কংগ্রেসের ইন্ডি জোটের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এই সব হলো বাসের ওই যুবকটির মতো ইন্ডি জোটের কুশীলবদের অসঙ্গতি। যুবকটির শরীরে ছিল সুন্দর সাফারি। জামা ও প্যান্টের একই কাপড়ের মিল। ইন্ডি জোটেরও সেই ধরনের মিল আছে। এরা সবাই দাগি। অনেকেই বেলে আছেন, কেউ কেউ জেলে যাওয়ার পথে পা বাড়িয়ে আছে। এদের অধিকাংশই আর্থিক অপরাধী। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। এরা দু'মুখো সাপ। তাই এরা সরকার গড়তে না পারলেও আনন্দিত। আনন্দিত এই জন্যই যে নরেন্দ্র মোদীর দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। সিপিএম নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করেছে।

এরা তালে আছে নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপিকে বেকায়দায় ফেলায়। তাহলে এদের ষোলোকলা পূর্ণ হয়। এরা চায় দেশটাকে লুঠ করতে। বৈদেশিক অশুভ শক্তি আছে এদের পিছনে। সেই শক্তি চায় না ভারত বিশ্বগুরু হোক। ইন্ডি জোটের ঘটক দলগুলি দেশটাকে একটা লুটেপুটে খাওয়ার জায়গা বলে মনে করে। তাই এদেশে বৈদেশিক অনুপ্রবেশকারী এলে এরা খুশি হয়। তাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড তৈরি করে দেয়। এদের হয়েই সিএএ-কে বাধা দেয়। বিনিময়ে অনুপ্রবেশকারীরা তাদের হয়ে অস্ত্র ধরে। খুন ও ধর্ষণ করে। ভোটতো দেয়ই। ইন্ডি জোট তাক করে আছে, কখন এনডিএ-র শরিকরা বিগড়ে যাবে। তাক করে আছে কখন চন্দ্রবাবু নাইডু বা নীতীশ কুমার বিদ্রোহ করবেন। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, নীতীশ কুমার জানেন, লালু প্রসাদ যাদব কীভাবে তার তার জেডিইউ-কে লালুর হারিকেনের তেল হতে বলেছিল। বিজেপি নীতীশের থেকে বেশি আসন পেয়েও বিহারে নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী করেছে। আর চন্দ্রবাবু নাইডু ২০১৪ সালে বিজেপি বিরোধী জোটের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতেই অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি দশ বছরের জন্য হারাতে হয়েছিল। এবার বিজেপির হাত ধরেই আবার তাঁর হাতছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ফেরত পেয়েছেন। আশা করি বুদ্ধিমান নীতীশ কুমার এবং চন্দ্রবাবু নাইডু কংগ্রেসের পাতা ফাঁদে পা দেবেন না। এরপরও যদি কোনো ভুল করেন তাহলে মানুষ আর তাদের ক্ষমা করবে না।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

সন্তানের সার্বিক বিকাশে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

মৌ চৌধুরী

একটা সময় মেয়েরা ছিল কেবলই রূপে লক্ষ্মী আর গুণে সরস্বতী হয়ে সংসার সামলে সন্তান জন্ম দেওয়ার মেশিন। এর কিছু বেচাল হলেই নিন্দার ঝড় উঠত পরিবারে। সন্তানহীনা নারীর কোনও অধিকার ছিল না শুভকাজে অংশ নেওয়ার। কালের নিয়মে চাকা এতটাই ঘুরে গিয়েছে যে মেয়েরা এখন সমাজকে দেখিয়ে দিয়েছে ইচ্ছে করলেই তারা সব পারে। চাইলেই সংসার ভেঙে বের হয়ে যাওয়াটা অনেক নারীর কাছেই তুচ্ছ বিষয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের জন্য নারী স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা এসে গিয়েছে। ফলে সমাজে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আমাদের দিদিমা, ঠাকুমাদের সময়ে স্বামীর পা ধুইয়ে চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ অথবা সূর্য ওঠার আগে স্বামীর পাশ থেকে উঠে স্নান সেরে ঘরের কাজে হাত লাগানোর রীতি অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন বিয়ের পরের দিনই শাখা পলা খুলে শ্যাম্পু দিয়ে সিঁদুর মুছে ফেলতে অনেক মেয়েরই সংস্কারে বাধে না।

সব কিছুরই ভালো মন্দ দুটো দিকই আছে। কিন্তু স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা বর্তমান প্রজন্মের উপর একটি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। মায়েদের রুচিবোধ পালটে যাওয়াতে শিশুরা সঠিক পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কারের বংশগত পরম্পরা কোনোটাই তাদের ভেতর নেই। একটু খেয়াল করলেই শোনা যায় এক অসহায় প্রশ্ন, কেবল কি মায়ের দায়িত্ব সবটাই? হ্যাঁ, পরিবারের বাকি সদস্যদেরও দায় কম নেই। পরিবারের পরিবেশ ও বাবা মায়ের আচরণ সঠিক থাকা চাই। তবে আর্থিক প্রয়োজন ও অন্যান্য কারণের যৌথ পরিবার প্রায় আর নেই। কোনও মেয়েই আর চায় না বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের নিয়ে থাকতে। শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের শত্রু ধরে নিয়ে অহেতুক রাগ অভিমান করে সন্তানকে ভুল শিক্ষা দিতে নেই। তাতে সন্তান ভুল পথে চলবে। সেই শিক্ষা পরে মায়ের উপরেও কিন্তু বুমেরাং হতে পারে।

এখনকার সন্তানরা অনেক বেশি সংবেদনশীল। কারণ বেশিরভাগ পরিবারে সন্তান সংখ্যা একটি বা দুটি। মা বাবা দুজনেই যদি চাকুরি করেন তবে সন্তান খুব বেশি সময় তাদের কাছে পায় না। আবার যে পরিবারে প্রাচুর্য অনেক, সেখানে অভাব কী সন্তান বুঝতে পারে না। কোনও কিছু ভাগ করে নেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। তথাকথিত হাই সোসাইটির সন্তানরা এক অদ্ভুত মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠছে।

এখনকার মায়েরা বা ভাবী মায়েরা একটু ভেবে দেখবেন আপনার সন্তান কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ। আপনার সন্তান নিজের কেরিয়ার গড়ে বিদেশে চলে গেল বা আপনার ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল তাতে কি আপনি ভালো থাকবেন? সেক্ষেত্রে শেকড়ের টানটা যেন থাকে। ক্যারিয়ার গড়ার পাশাপাশি সে যেন সৎ, ভদ্র, বিনয়ী, পরোপকারী হয়। নিজের পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। এভাবেই তাকে তৈরি করুন। কেবলমাত্র অর্থ রোজগারের মেশিন তৈরি হয়ে নিজের হতাশা কাটাতে নেশাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। সুসন্তান পরিবারকে ভালো রাখে। পরিবার ভালো থাকলে সমাজও ভালো থাকবে। সমাজ ভালো থাকলে দেশ ভালো থাকবে।

আজকের শিশুদের বন্ধুত্ব ভালোবাসার ঘাটতি তাদের বেপরোয়া করে তুলেছে। ধৈর্য বলে কিছু নেই। ঈর্ষা, ক্রোধ, জেদ, সব কিছু পাওয়ার মনোভাব তাদের ভেতর একটা অস্থিরতা তৈরি করেছে। আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন ঘটনার মাধমে সেসব জানতে পারি। বর্তমান যুগের মায়েরা যদি এই নিত্য ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি দেখে সঠিক দায়িত্ব কর্তব্য পালনে আগ্রহী হন তবে একদিন দেশের দশের তো বটেই, আপনি সুসন্তানের জননী হিসেবে নিজেকে গর্ববোধ করবেন।

আমরা মায়েরা যদি আমাদের সন্তানকে সচেতনভাবে বড়ো করে তুলি, তবে সে অবশ্যই সুসংস্কারের আলো পাবে। এটা কোনও স্কুল বা কলেজে পাবে না। অনেক সময়ই দেখা যায় একটি নীচু ক্লাসের পড়ুয়া অন্য কোনও পড়ুয়ার জিনিস কাউকে না জানিয়ে নিয়ে আসে। সেটা কিন্তু সবার আগে মায়ের চোখে পড়বে। মায়ের দায়িত্ব তার সন্তানকে এমন কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বোঝানোর। প্রয়োজনে কিছুটা শাসন করা। এবং অবশ্যই সেই জিনিসটি সকলের সামনে সন্তানকে দিয়েই ফেরত দেওয়া। একটু খেয়াল রাখা সন্তান অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ না হয়ে পড়ে অথবা মিথ্যেবাদী না হয়ে পড়ে। স্কুলে বা খেলার মাঠে গিয়ে যেন মারপিট না করে। আপনার সন্তানকে ক্লাসে প্রথম হতেই হবে এই ধরনের অকারণ চাপ দেওয়ার মতো ভুল করবেন না।

আমাদের সন্তান যেন বড়োদের শ্রদ্ধাশীল হয়। এই বিষয়টি শেখানোর দায়িত্ব মা-বাবা দুজনেরই। সকলেই জানি সন্তান 'প্রকৃত মানুষ' হয় মা-বাবার প্রচেষ্টার ফলে। পরীক্ষায় কত নম্বর পেল তার থেকেও জরুরি হলো সন্তান কতটা শিখতে পারছে বা নিতে পারছে। সব বিষয়ে পারদর্শী করতে গিয়ে সন্তান যেন নাজেহাল না হয়ে পড়ে।

অহেতুক অপরের সন্তানের প্রশংসা করে নিজের সন্তানকে ছোটো করবেন না। আর না চাইতেই সব কিছু না দেওয়াই ভালো। কারণ চাওয়া আর প্রত্যাশার শেষ নেই। ছোটোদের ভেতর পাওয়ার আনন্দটা থাকা দরকার। আরও একটা জরুরি বিষয় হলো সন্তানকে সব দিক থেকে আদর্শ তৈরি করতে গেলে মায়ের সঙ্গে বাবারও সার্বিক যোগদান প্রয়োজন। □

তামাক এক প্রাণঘাতী নেশা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

তামাক সেবন ও ধূমপান করার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। আজকাল অল্প বয়স থেকেই বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে কমবয়সি ছেলে-মেয়েরা। এর জন্য পানমশলা, গুটখা, সিগারেট, মদ ইত্যাদিকে দায়ী করা হচ্ছে। এর সঙ্গে মদ্যপানও দ্রুতগতিতে ক্যানসারকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ মদের সঙ্গে এমন কিছু রাসায়নিক মেশানো থাকে যাতে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতি বছর ৩১ মে তামাক বিরোধী দিন হিসেবে মানা হয়। দুনিয়ার প্রায় ১০০ কোটি মানুষ তামাক সেবন করে থাকেন। তামাক সেবনের ফলে ক্যানসার ছাড়াও নানান প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হয়। সিগারেটের ধোঁয়াতে ৪৫ রকমের রসায়ন মজুত থাকে যা ক্যানসার হতে সাহায্য করে। গর্ভবতী মহিলা তামাক সেবন করলে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি এমনকী গর্ভপাত পর্যন্ত হতে পারে। তামাক যারা সেবন করেন তারা সাধারণত নিম্ন বা মধ্য আয় সম্পন্ন হয়। এদের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ। আমাদের দেশে তামাক সেবন করেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি। এর মধ্যে ১৬ শতাংশ সিগারেট, ৪৪ শতাংশ বিড়ি ও ৪০ শতাংশ অন্যভাবে তামাক সেবন করে থাকেন। তামাক সেবনের খরচ থেকে অনেক বেশি খরচ তামাকজনিত রোগ ব্যাধির ফলে হয়ে থাকে।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সরকার প্রায় ২৪ হাজার কোটির রাজস্ব তামাক থেকে আদায় করে। আর এর থেকে হওয়া রোগের জন্য সরকারের খরচ হয় ২৮ হাজার কোটি টাকা। আমাদের দেশে শুধু বিড়ি উৎপাদনে ৬ কোটি শ্রমিক নিয়োজিত আছে। ভারতে ২০০৮ সাল থেকে সার্বজনীন স্থানে তামাক সেবন নিষিদ্ধ। তামাক আমাদের দেশে ৭৫ কোটি কিলো প্রতিবছর উৎপাদন হয়ে থাকে। সরাসরি তামাক সেবনে গরিবরাই এগিয়ে। ভারতে প্রতিবছর তামাক সেবনের কারণে নয় লক্ষ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ফুসফুস ক্যানসারের ক্ষেত্রে প্রতি ১০ জন রোগীর মধ্যে ৯টির জনই দায়ী হলো তামাক সেবন জনিত।

স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন ধূমপান করে থাকে। ধূমপান যারা করে তাদেরই ভয় সবচেয়ে বেশি। তামাক সেবনের ফলে ফুসফুস, হৃদয় ইত্যাদি স্থানে ক্যানসার বাসা বাঁধতে পারে। এই ব্যাধি রোগীকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়। এর ফলে ধূমপায়ী ব্যক্তির করোনা হবার ফলে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। সিগারেট যারা পান করেন তাদের মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি।

এই সব রোগীর অক্সিজেনের চাহিদা বেশি থাকে, যার অভাবে মৃত্যু ঘটতে পারে। কারণ ধূমপানের ফলে এদের ফুসফুসে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। এর ফলে ওপিডি নামক ব্যাধিতে এরা আক্রান্ত হয় ও মৃত্যু মুখে পতিত হয়। তামাক খাওয়া, চিবনো বা ধূমপান যে ভাবেই ব্যবহৃত হোক না কেন, সবটাই ক্ষতিকারক ও প্রাণঘাতী। খৈনি ব্যবহারকারীদের গলা, জিভ, মাড়ি, ঠোঁট ও পেটে ক্যানসার বাসা বাঁধে। তামাক সেবীরা খাদ্য পুরামাত্রায় খেতে পারে না। তাই তামাকের ব্যবহার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ধূমপান বেশ কিছু রোগ ডেকে আনে। এই সব ব্যক্তির করোনা হলে তা অন্যদের থেকে বেশি প্রাণঘাতী হয়ে থাকে। আজকাল বেশিরভাগ মানুষ তামাক সেবনের কুফল স্বরূপ নানারোগে আক্রান্ত হন। তামাক সেবনের ফলে ২৫ ধরনের ব্যাধি ও ৪০ ধরনের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন মুখ, গলা, ফুসফুস, জিভ, প্রস্টেট, পেট ও ব্রেনে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দেখে মহিলা অপেক্ষা পুরুষরা অধিক মাত্রায় ধূমপান করে। ধূমপানের ফলে ব্রঙ্কাইটিস, এসিডিটি, টিবি, ব্লাড প্রেসার, হাট অ্যাটাক, নপুংসকতা, মাইগ্রেন ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ হতে পারে। ধূমপায়ীদের করোনা বেশিমাত্রায় আক্রমণ করে ও মৃত্যু ডেকে আনে। তাই ধূমপান ত্যাগ করা উচিত।

নীচের হোমিও ওষুধগুলি লক্ষণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। **ইপিকাক**— ভীষণ বমিভাব, **আর্সেনিক অ্যালম্বাম**— তামাকের কুফল থেকে মুক্ত করার জন্য। **নাক্সভম**— তামাক ব্যবহারকারীর পেট খারাপের জন্য। **ফসফরাস**— বুক ধড়ফড়, নপুংসকতা। **ইগ্নেসিয়া**— তামাক চেবানোর জন্য উদ্গার। **প্ল্যান্টাগো**— দাঁতে ব্যাথার জন্য। **সিপিয়া**— স্নায়ু রোগ ইত্যাদির জন্য। **লাইকোপোডিয়াম**— নপুংসকতার জন্য। **জেলসিমিয়াম**— মাথার যন্ত্রণা ও মাথাঘোরা। **টেবেকম**— ২০০ বা ১০০০ শক্তি ধূমপান ছাড়াবার জন্য মাঝে মাঝে নিতে হবে। □

বিযুক্তির নঞর্থকতাই রোগ সদর্থক সংযুক্তির নাম যোগ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো/ সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও'। যোগ মানে দৈহিক সমন্বয়, শারীরিক ও মানসিক সম্পূর্ণতা। আর তাই যোগের শক্তিতে ভগবৎ-দর্শন হয়। যোগ মানে সনাতনী শক্তির অপূর্ব মেলবন্ধন। যোগ সুস্থ দেহের সক্রিয় মেলবন্ধন। সবলতার শান্তি। ২১ জুন 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' মানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভায় বিশ্বময় আলোকিত হয়ে ওঠা।

ভারতীয় 'যোগ' বলতে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন বোঝায়। যোগ ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের সবচাইতে মূল্যবান এক দান। দেহ ও মনের একত্রীকরণ করে, চিন্তা ও চেতনার সংযোগ ঘটিয়ে মনের আরাম আনে। তাই বৃহত্তর পরিমণ্ডল লাভ করি আমরা। মানুষ-প্রকৃতি ও বিশ্বলোকের মাঝে সদর্থক মেলবন্ধন ঘটে। মাঙ্গলিক অনুশীলনে স্বাস্থ্যমঙ্গলের জন্য শপথ নেওয়ার কার্যক্রম চলে।

যোগ তো কেবল অনুশীলন নয়! নিজের সমগ্রতা নিয়ে একীভুত হওয়ার শিক্ষা, নিজের সমগ্র সত্তার খোঁজ নিজেই পেয়ে যাওয়া। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে নিজেকে অনুক্ষণ আবিষ্কার করা। অনুপম জীবনশৈলীর পরিবর্তনে, চেতনার উজ্জ্বল উদ্ধারে সেই খোঁজ আমরা নিরন্তর করে চলেছি।

২১ জুন সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সমস্ত ক্লাবে, ব্যায়ামের আখড়ায়, বিকেলের আড্ডায়, সাংস্কৃতিক/সামাজিক শাখায় বিশ্ব যোগদিবস পালিত হোক। তাতে ছাত্র-গবেষক-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের শামিল করা যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে শামিল হবেন সাধারণ মানুষ।

কেবল শরীরচর্চা নয়, খাদ্যাখাদ্য-বিচার, পরিপূর্ণ মানসচর্চা ও জীবনচর্যার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। স্লোগান হতে পারে—

জীবন চর্যায় মানস যোগ।/বিনা ওষুধে খণ্ডাবো রোগ।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই দিনটিতে বিশ্বস্বাস্থ্য, একতা আর শান্তির তাৎপর্য আরোপ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এদিন পালিত হবে যোগাভ্যাস, মনোনিবেশ, যোগ সম্পর্কে সচেতনতা, যোগের উপকারিতা এবং ব্যক্তিগত জীবনশৈলীতে যোগের সংযুক্তি ইত্যাদি বিষয়। ২০১৫ সাল থেকে এই আন্তর্জাতিক দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে। ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই দিনটি অনুমোদিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভায় দিনটি পালন করার প্রস্তাব আনেন। দিনটির বিশেষত্ব হচ্ছে উত্তর গোলার্ধে এটি দীর্ঘতম দিবস অর্থাৎ বড়দিন। এরপরই দক্ষিণায়ন শুরু। সবল মানসিকতার চিরন্তন ঐতিহ্যে বিশ্ব-বন্দনার এই দিনে সবাই যোগে শামিল হবেন এবং সপরিবারে সুস্থ থাকবেন, এটাই যোগোদ্যানে যোগদানের ভাবনা। ■

যোগগুরু যাঁরা যোগের বিশ্বায়ন ঘটিয়েছেন

অর্পিতা

যোগ সারা বিশ্বে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। শারীরিক ও মানসিক শান্তির জন্য প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যোগের যে এক বিরাট ভূমিকা আছে তা বর্তমান প্রজন্মকে আকৃষ্ট করেছে। ভারতীয় যোগ বিদ্যার চর্চা ঋষি/গুরু পরম্পরার মাধ্যমে অবিচল ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে। এর পেছনে প্রাচীন ঋষি থেকে শুরু করে বর্তমান যোগগুরু ও সাধকদের জ্ঞান ও নিষ্ঠার মাধ্যমে ভারত তথা সারাবিশ্বে যোগের মহিমা ছড়িয়ে পড়েছে। এই যোগচর্চার মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ-সবল হওয়ার এক পথ খুঁজে পেয়েছে। এর জন্য আধুনিক ভারতের কয়েকজন মহান যোগগুরুর অবদান অনস্বীকার্য। তাদের অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে যোগ ভারত তথা সারাবিশ্বে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে প্রভাবিত করেছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী শিবানন্দ, যোগনিষ্ঠ বি.কে.এস আয়েঙ্গার, মাতা অমৃতানন্দময়ী, শ্রীশ্রীরবিশঙ্কর প্রমুখ।

পরমহংস যোগানন্দ : আত্মোপলব্ধির প্রদীপ' উত্তরপ্রদেদেশের গোরক্ষপুর গঙ্গার তীর থেকে আমেরিকার ব্যস্ত রাস্তায় পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর মহাকাব্যিক 'যোগীর আত্মজীবনী' বা 'অটোবায়োগ্রাফি অফ এন যোগী' যোগ বিজ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধির অনুসন্ধানের পথ বিশ্বে প্রশস্ত করেছে ১৯২০ সালে 'সেল্ফ রিয়ালাইজেশন ফেলোশিপের' প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি ক্রিয়াযোগকে একটি পবিত্র পদ্ধতি যা আধ্যাত্মিক জাগরণের জন্য সারা বিশ্বের কাছে নতুন পথ খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সীমা অতিক্রম করে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগের জন্য এক অসাধারণ ব্যবহারিক পদ্ধতি প্রদান করে। তিনি নিয়মিত ধ্যান, আত্মশৃঙ্খলা এবং মানুষের সেবা উপর জোর দিয়েছেন যা আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক।

মাতা অমৃতানন্দময়ী : দিব্য প্রেমের প্রতীক হিসেবে সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষকে করুণার দ্বারা অণুপ্রাণিত করেছেন। কেরালার মানুষ আম্মার জীবন নিঃস্বার্থ সেবা এবং অবিচল প্রেমের এক জীবন্ত উদাহরণ। তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা ও প্রেমের মাধ্যমে নবজীবন দান করেছেন। হাসপাতাল, স্কুল ও অনাথালয় তার মানবিক প্রকল্পের নিদর্শন বিশ্বব্যাপীর শ্রদ্ধা ও পুরস্কার লাভ করেছেন। তার জন্য তিনি মানুষের দুঃখ লাঘব এবং সম্প্রীতি প্রচারের জন্য ২০০২ সালে তিনি 'গান্ধী কিং' সম্মানে সম্মানিত হয়ে বহুদিন ধরেই ভারতীয় হয়েছেন।

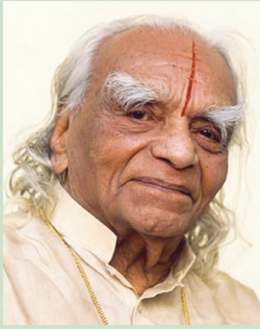

বি.কে.এস আয়েঙ্গার : তিনি যোগ জগতের এক উচ্চস্তরের ব্যক্তিত্ব। তাঁর যোগ- অনুশীলনের পদ্ধতি নির্ভুল এবং তাঁর অনুশীলন পদ্ধতি সকল বয়সের ও সামর্থ্যের মানুষের যোগ শিক্ষার পথ সুগম করেছে। 'লাইট অন যোগা' তাঁর মৌলিক পুস্তকটি সারাবিশ্ব জুড়ে মানুষের মধ্যে যোগ অভ্যাসের দিশা পালটে দিয়েছেন। যা আন্তর্জাতিক স্তরে 'আয়েঙ্গার যোগা' নামে পরিচিত। শৈশবেই শুরু হয়েছিল তাঁর যোগযাত্রা। তাঁর নিষ্ঠাও অধ্যাবসায় যোগাচার্য কৃষ্ণমাচার্যের কাছে বছরের পর চলতে থাকে। দীর্ঘ বছর অভ্যাসের পর যোগ অনুশীলনের নতুন শৈলীর তিনি বিকাশ করেছেন। বিভিন্ন যোগউপাদানের দ্বারা যেমন ব্লক, বেল্ট ও বোলস্টারের মতো সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে অনুশীলনকারীদের নির্ভুলভাবে যোগ অভ্যাসের মার্গদর্শন করেছেন।

তাঁর এই পদ্ধতি সকল জীবনধারার মানুষের জন্য সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর এই শিক্ষা ও পদ্ধতি অসংখ্য মানুষকে যোগ চর্চার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নতি করার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্মিক পথের দিকে এগিয়ে চলার জন্য। তার এই অসাধারণ কাজের জন্য ভারত সরকার ২০০২ সালে তাঁকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করেছে।

স্বামী শিবানন্দ : বিংশ শতাব্দীতে স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী জ্ঞান ও সেবার মাধ্যমে সারাবিশ্বকে উদ্ভাসিত করেছেন। ১৮৮৭ সালে তামিলনাড়ুতে জন্মগ্রহণকারী শিবানন্দ একজন চিকিৎসক থেকে আধ্যাত্মিকতার ও যোগের যাত্রা শুরু করেন। তাঁর যোগশিক্ষা ও চর্চার অনুপ্রেরণা স্বরূপ ১৯৩৬ সালে 'দিব্যজীবন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন তার মাধ্যমে যোগ, বেদান্ত এবং আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'দ্য প্রাকটিস্ অফ যোগ' এবং 'ব্লিস ডিভাইন'-সহ তাঁর বহুল প্রচারিত পুস্তক বিশ্বজুড়ে যোগ অন্বেষণকারীদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে। স্বামী শিবানন্দের শিক্ষা, নিঃস্বার্থ সেবা, ভক্তি, করুণা, বিনয় ও সহমর্মিতার মাধ্যমে শরীর ও মনকে একত্রিত করেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্যান ও নৈতিক নীতিগুলি পালন করার মাধ্যমে তাকে আধুনিক ভারতের সাধুনামে পরিচিতি দিয়েছে।

এছাড়া বাবা রামদেব, শ্রীশ্রীরবিশঙ্কর-সহ বহু যোগগুরু যোগের মাধ্যমে মানুষের জীবনে আলোক সঞ্চার করে চলেছেন। ■

আত্মানং বৈ বিজানথ

অজয় ভট্টাচার্য

গ্রিসের রাজধানী এথেন্স থেকে ডেলফির দূরত্ব ১৬০ কিলোমিটার। ডেলফিতে দেবতা অ্যাপোলোর জন্য নির্মিত মন্দিরটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই মন্দিরের তোরণশীর্ষে প্রস্তরফলকে খোদাই করা ছিল একটি মহাবাণী— Know thyself বা নিজেকে জানো। যোগশাস্ত্রের ভাষায় 'আত্মানং বৈ বিজানথ'। অর্থাৎ নিজের মধ্যে যে দিব্যস্বরূপ বিদ্যমান তাকে উপলব্ধি কর। যদিও দিব্যস্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ কথা নয়। এর জন্য প্রয়োজন হয় আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা। আর এটাই ধর্মের বিশুদ্ধভাব। প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা ধর্মের এই বিশুদ্ধভাবকে ধর্মের নামে প্রচলিত অবান্তর ও অযৌক্তিক আচারগুলো থেকে সুরক্ষিত রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি হলো যোগশাস্ত্র।

ধর্মের অসার অংশকে বাদ দিয়ে সারবস্তুকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করাই যোগশাস্ত্রের কাজ। তার মানে এই নয় যে অসার অংশ অপ্রয়োজনীয়। পূজাআচ্চা, যাগযজ্ঞ করার মাধ্যমে মানুষের মনে সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়। যার ফলে সে যোগাভ্যাসের উপযোগী হয়ে উঠে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে আচার অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন আছে। শরীর ও মনকে যোগাভ্যাসের উপযোগী করে তোলার জন্য আচার অনুষ্ঠানের ভূমিকা কম নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়, 'প্রদীপ জ্বালাবার আগে আরও একটি পর্ব থাকে। সলতে পাকানোর পর্ব।'

যোগ বিদ্যার আচার্যগণ বলেন, 'ধর্ম কেবল পূর্বপুরুষদের চাপিয়ে দেওয়া কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না। বরং নিজের মধ্যে দিব্যস্বরূপ উপলব্ধি করাই প্রকৃত ধর্ম।' তাই ধর্ম যতদিন না অনুভূত হয়, ততদিন ধর্মের কথা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। কেবলমাত্র আচার অনুষ্ঠান পালন করার মাধ্যমে ধার্মিক হওয়া যায় না। এই যে মানুষে মানুষে এত গণ্ডগোল, যুদ্ধ ও বাদানুবাদ, এর মূল কারণ সাধারণ মানুষ ধর্মের মূল উৎসে পৌঁছায় না। শুধু কতকগুলি আচার বিধি পালন করেই সন্তুষ্ট থাকে। আত্মাকে উপলব্ধি করে না। উপলব্ধি না করে আত্মা আছে, একথা বলবার অধিকার কারও নেই। একই রকমভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি না করে, ঈশ্বর আছেন বললে বিশ্বাসযোগ্য হয় না। এর চেয়ে নাস্তিক হওয়া ভালো। ভণ্ড তপস্বী অপেক্ষা স্পষ্টবাদী নাস্তিক হওয়া অনেক ভালো। রাজযোগ এই শিক্ষাই দেয়। যতক্ষণ না কোনো কিছু নিজে প্রত্যক্ষ করতে পারছি, ততক্ষণ তা বিশ্বাস করা উচিত নয়। আর এর জন্যই যোগের প্রয়োজন। আত্মাকে দর্শন করা বা নিজের মধ্যে দিব্য স্বরূপকে উপলব্ধি করার নামই যোগ, বা 'নিজেকে জানা'।

এখন প্রশ্ন হলো, দিব্য স্বরূপকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে হঠযোগের ভূমিকা কতটুকু? উত্তরে বলা যায়, মানুষকে দীর্ঘজীবী করাই হঠযোগের মূল উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যই তার মূল ভাব, এটাই হঠযোগীদের মূল লক্ষ্য। তাই হঠযোগে খুব বেশি আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। অপরদিকে নিজেকে জানতে হলে, প্রাণায়াম দ্বারা সর্বাগ্রে মনের মলিনতা দূর করা প্রয়োজন। মনকে শান্ত করা প্রয়োজন। তারপর সেই মন ব্রহ্মে স্থিত হতে পারে। তাই প্রাণায়াম করলে ধ্যান করা সহজ হয়। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই প্রাণশক্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সেই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে হবে শরীরে। তবেই আমরা শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম শক্তিগুলি সম্পর্কে জানতে পারব। সেকারণে যোগাভ্যাসের শুরুতেই প্রাণায়াম বা প্রাণের সংযম অভ্যাস করা প্রয়োজন।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। তা সত্ত্বেও আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি মনোযোগী হই না। অথচ অল্প কিছু সময়ের জন্যও যদি আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি একান্ত মনোযাগী হতে পারি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের মন এবং তৎসহ শরীর ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছে। এরই নাম 'mindfulness', যা আসলে একটি যোগসাধন পদ্ধতি। 'Mindfulness is a sort of meditaton where you are mindful of every thought and you are mindful of your breath'. শ্বাস-প্রশ্বাসকে গভীর মনোযোগ-সহ লক্ষ্য রেখে ধ্যান করার পদ্ধতিকে বৌদ্ধমতে বলে বিপশ্যনা। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই ধ্যান পদ্ধতিটি ভারতে বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এটি ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছিল। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধ এটিকে পুনরায় পুনরুজ্জীবিত করেন। সংস্কৃত ভাষায় বিপশ্যনা মানে কোনো কিছুকে 'বিশেষ ভাবে দেখা', এক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাসকে মনোযোগ-সহ দেখাকে বোঝানো হচ্ছে।

এরূপ যোগাভ্যাসের ফলে যে মুহূর্তে সারা শরীরে শক্তি প্রবাহের গতি অনুভব করতে পারব, তখন থেকেই সকল বিশ্বাস-অবিশ্বাস সংক্রান্ত সংশয় দূর হবে। কিন্তু এর জন্য প্রতিদিন অভ্যাস করা প্রয়োজন। একজন প্রকৃত যোগী এমন সূক্ষ্ম অনুভূতির অবস্থা লাভ করতে পারেন যে তিনি চিত্ত নামক হ্রদের তলদেশে কী আছে তাও স্পষ্ট দেখতে পারেন। যখন জলের উপরে নিস্তরঙ্গ থাকে, তখনই তার তলদেশ দেখা সম্ভব হয়। যোগাভ্যাসে চিত্ত শান্ত হয়, নির্মল হয়। একমাত্র সেই অবস্থাতে আমরা নিজের স্বরূপ বুঝতে পারি। তখন ওই তরঙ্গগুলোর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে না ফেলার মতো মনের জোর তৈরি হয়ে যায়। আর তখনই সেই মনকে নিজের স্বরূপে স্থির রাখা যায়। এক কথায় চিত্তকে বিভিন্ন প্রকার আকার বা পরিণাম গ্রহণ করতে না দেওয়াই হলো যোগ। ■

জগৎকল্যাণে ক্রিয়াযোগ

শুভেন্দু সরকার

আজ বিশ্ব অশান্ত। চারদিকে মনুষ্যত্বের ধ্বংসাত্মক ছবি ধরা পড়ছে। মানুষের এই ধ্বংসাত্মক মনকে স্থির করে জগৎ কল্যাণের কাজে নিজেকে তুলে ধরার জন্য মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ দর্শন প্রবর্তন করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা অর্জুনকে এই যোগবিদ্যা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মানুষ যোগাবলম্বন করে নিজের স্বরূপের সাক্ষাৎ না করে, ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভোগের দিকে ছুটে চলেছে। তাই আজ বিশ্ব অশান্ত। মানুষের এই অশান্ত মনকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিশ্বকল্যাণের লক্ষ্যে প্রায় দুশোবছর আগে মহাবতার বাবাজী মহারাজের কাছে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হন শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী। মহর্ষি পতঞ্জলি অথবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শেখানো সেই যোগেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো ক্রিয়াযোগ নামে।

ক্রিয়াযোগের কৌশলসমূহ কর্মযোগ, রাজযোগে ও ভক্তিযোগের সার। সেই জ্ঞান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদভগবদগীতায় ব্যাখ্যা করেছেন। ক্রিয়াযোগ প্রকৃত অর্থে যোগ শাস্ত্রের ফলিত অংশ। সেই জন্য এই শাস্ত্রকে ঈশ্বর প্রণিধানের বৈজ্ঞানিক কৌশল বলা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক নতুন যুগের প্রবর্তন হলো যখন কল্পযোগী বাবাজী মহারাজ এই যোগ শাস্ত্রকে একটা নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রূপান্তর ঘটিয়ে পৃথিবীকে পরিবেশন করলেন তাঁর শিষ্য লাহিড়ী মাধ্যমে। তিনি এই যোগ মানুষ্যজাতির কল্যাণে উৎসর্গ করলেন। লাহিড়ী বাবার শিষ্য স্বামী যুক্তেশ্বরগিরিজী এই যোগ শিক্ষা তাঁর শিষ্য পরমহংস যোগানন্দজীকে শেখালেন এবং তিনি এই যোগ পশ্চিম দেশগুলিতে প্রচার ও প্রসার করলেন। তিনি ১৯২০ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতে এলেন এবং পরবর্তী ৩০ বছর সময় প্রায় এক লক্ষ মানুষকে

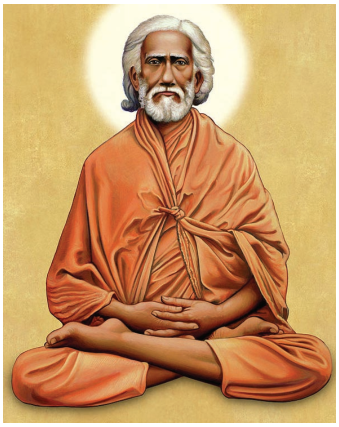
শ্রী শ্রী যুক্তেশ্বর গিরি

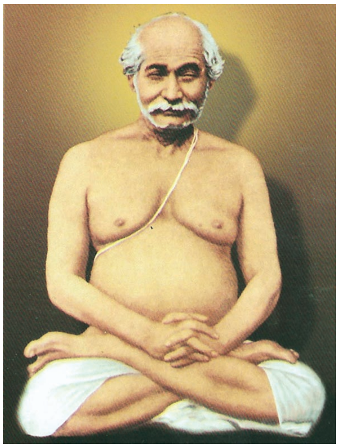
শ্রী শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী

ক্রিয়াযোগের প্রথম ক্রিয়ায় দীক্ষিত করলেন। এই শক্তিশালী আধ্যাত্মিক পদক্ষেপ আমেরিকা তথা পশ্চিমি দেশে একটি ভিত্তি তৈরি করেছে এবং যোগকে জনপ্রিয় আন্দোলনে পরিণত করেছে। যা আজও কুসুমিত হয়ে চলেছে। আত্মজ্ঞানের, আত্মবিকাশের পথ শেখাতে গিয়ে বাবাজী মহারাজ লাহিড়ীবাবাকে যেই ক্রিয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে ছিলেন, তা মূলত ছ'ভাগে বিভক্ত। এই কৌশলগুলি আত্মজ্ঞানী গুরু এবং যথার্থ যোগ্যতা প্রাপ্ত যোগাচার্য শিক্ষক ব্যতীত আয়ত্ত সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অনুচিত। এই যোগে আধ্যাত্মিক পথে চলার সর্বোচ্চ পাথেয়, এই কৌশল গীতার উল্লিখিত আত্মোপলব্ধির যোগ সাধনার শিক্ষা দেয়।

প্রথম ক্রিয়া :

প্রথম ক্রিয়ায় নিজের শিড়দাঁড়ার মধ্যে ঈশ্বর অনুভূতির প্রক্রিয়াকে ক্রিয়াশীল করার পর নিজের স্বাভাবিক মনকে উচ্চতর চেতনায় পরিবর্তন করতে পারা যায় এবং দিব্য তিনটি বিষয়— ধ্বনি, জ্যোতি ও স্পন্দন অনুভব করা যায়। নিজের মাথাটা মাটিতে স্পর্শ করিয়ে দিলেই শিরদাঁড়া ও কপালের গোলার্ধ চৌম্বকীয় আবেশে আবেশিত হয়। মস্তিষ্ক দিব্যজ্যোতি দর্শন করতে পারে। শিরদাঁড়ার মধ্যে অবস্থিত সাতটি চক্রের মধ্যে অনুভব

করা যায় দিব্যশক্তি কীভাবে ওঠা-নামা করছে ও মস্তিষ্ক ও আত্মাকে শক্তি প্রদান করছে। প্রথম পাঁচটি চক্র হচ্ছে শয়তানের রাজ্য— এখানে অজ্ঞান ও দুষ্টবুদ্ধি ভ্রমণ করে। ছয় ও সাত চক্র হচ্ছে স্বর্গরাজ্য, যেখানে ভগবান স্বয়ং সব কাজ সম্পাদন ও ক্রিয়াশীল রাখেন। প্রথম ক্রিয়ায় কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে সুপ্তাবস্থা থেকে মূলাধার বেয়ে উপরে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত নিয়ে যায়। সাধক উপলব্ধি করতে পারেন যে একটি দিব্য জ্যোতি তাঁর শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে ওঠা-নামা করছে। মহামুদ্রায় (শারীরিক মুদ্রার প্রক্রিয়া) শরীরকে কর্ষণ করে এবং শরীরেব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি যেমন, হৃদপিণ্ড, পাচনতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রগুলিকে সতেজ করে। তখন মন, বুদ্ধি, বিচার ও অহংকার শান্ত হয়ে যায়। তখন ঈশ্বরের বাণী অর্থাৎ ধ্বনি শুনতে পারা যায়। এই অভ্যাসের দ্বারা সারাদিন ধ্বনি শোনা যায়, একে বলা হয় 'অনাহত ধ্বনি'। প্রথম ক্রিয়ায় সাধক 'শুভেচ্ছা সমাধি' অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেন। যখন উচ্চতর চেতন অবস্থা এবং মনের শান্ত পরিস্থিতি হয়, তখন এই অবস্থার উদ্ভব হয়।

দ্বিতীয় ক্রিয়া :

দ্বিতীয় ক্রিয়ায় প্রতিটি চক্রের মধ্যে দিব্য ত্রিগুণ উপলব্ধি করার শিক্ষা দেওয়া হয়। নীচের পাঁচটি চক্রে ভগবান স্বয়ং রয়েছেন এবং সেগুলিকে সক্রিয় রেখেছেন, এই উপলব্ধি হবে এবং এই চক্রগুলির সেই অদম্য ইচ্ছা, অর্থাৎ অর্থ উপার্জন, শারীরিক মিলন, খাদ্যের লালসা, আবেগ ও সৃজনশীলতা, সেইগুলি এই উপলব্ধির পর ভগবত শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। রাগ, অহংকার, গৌরব ও নিষ্ঠুরতা, এগুলি প্রেমে পরিণত হবে। ক্রমশ শক্তি শিরদাঁড়ার উপরে উঠতে থাকে এবং প্রতিটি চক্রে নানান ধরনের দিব্যধ্বনি শোনা যায়। ধ্যানের মধ্য দিব্য জ্যোতির ঝলক এবং বারো ধরনের দিব্যধ্বনি, যেগুলি স্বর্গলোক হতে আসছে বোঝা যাবে। ব্যোমতত্ত্ব সমগ্র মস্তিষ্ককে ছেয়ে যাবে। ছ'টি চক্রে ৫০টি পদ্মের পাপড়িতে ধ্যান করতে হয়। সহস্রারের নীচের চক্রগুলিতে মূলাধারে ৪ দল, স্বাধিষ্ঠানে ৬ দল, মণিপুরে ১০ দল, অনাহততে ১২ দল, বিশুদ্ধতে ১৬ দল এবং আজ্ঞাচক্রে ২ দল। এই পথের দলগুলি আমাদের বহির্মুখী জীবন। একইভাবে শরীরের ৫০টি অংশকে জানতে হয় এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হয় যে ভগবান এদের মধ্যে দিয়ে কাজ করছেন। এই অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় যে শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ঈশ্বর রয়েছেন। মানুষ সারদিন যেই কাজই করুক না কেন, বুঝতে পারবে যে ভগবান একটা না একটা চক্র দিয়ে ক্রিয়াশীল রয়েছেন। যদি কোনও নেতিবাচক চিন্তা বা ইচ্ছা উঁকি মারে, সঙ্গে সঙ্গেই সেটাকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় ক্রিয়ার সমাধিকে 'বিচরিণী' সমাধি বলা হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি একটি একটি করে উপরের চক্রে উঠছে। শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে, শরীরে মুখ্য অঙ্গপ্রতঙ্গ এবং শরীরের নানান অংশ দিয়ে। এছাড়াও আরও কয়েকটি গুরুপ্রদত্ত বিদ্যা রয়েছে।

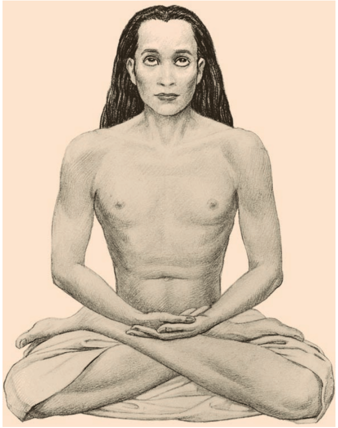

শ্রী শ্রী মহাবতার বাবাজী

শ্রী শ্রী পরমহংস যোগানন্দ

যদিও ক্রিয়াযোগ আত্মন্নোতি সাধনায় এক গুপ্ত ও গোপন বিদ্যা, যা গুরুপ্রদত্ত। তবে আমরা জগৎকল্যাণের বা সার্বিককল্যাণের আগে আত্মকল্যাণের জন্য সচেষ্ট না হলে সবই ভস্মে ঘি ঢালা হবে। তাই আত্মকল্যাণের মাধ্যমে জগৎকল্যাণের লক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেককে গুরুপ্রদত্ত যোগাবলম্বন করা আবশ্যক। ■

ফ : ৪

ভারতীয় সংস্কৃতিতে যোগের ভূমিকা

বিদিশা মৌলিক

ভারতীয় যোগের এক গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে। তাই আত্মোপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের একটি বিশেষ উপায় হচ্ছে যোগ অনুশীলন। সভ্যতার প্রথম থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি অধ্যাত্মসমন্বিত। যোগের উপস্থিতি ভারতের সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাসেও পাওয়া যায়। যোগ অনুশীলনের কথা প্রথম হিন্দু ধর্মের প্রাচীনতম পবিত্র গ্রন্থ বেদে বর্ণিত হয়েছে। ইতিহাসজুড়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতায় যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। যোগানুশীলনকে ব্যক্তির বুদ্ধি ও আত্মোপলব্ধির পাশাপাশি শারীরিক, মানসিক সুস্থতার উপায় হিসেবে সমগ্র বিশ্ব গ্রহণ করেছে। বর্তমান যুগে সারাবিশ্ব রোগে জর্জরিত, গোলোকধাঁধায় আবদ্ধ। বিশ্ব যখন রোগ থেকে মুক্তির রাস্তা খুঁজছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সারা বিশ্বকে এক বার্তা দিলেন, তা হলো ভারতীয় যোগানুশীলনে সুস্থ থাকার বার্তা। যা যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্থিতিকে উন্নত ও বিকশিত করতে ভারতীয় যোগের আজ বিশ্বায়ন ঘটেছে।

যোগ মানুষের মন একাগ্র করতে শেখায়। শরীরকে সুস্থ স্বাভাবিক করতে শেখায় এবং আজ আমরা দেখেছি সারাবিশ্বে যত ধরনের রোগ আছে, তার প্রায় ৯২ শতাংশ মানসিক অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। একে সাইকোসোমাটিক ডিজিজ বলা হয়। অর্থাৎ আগে মন অসুস্থ এবং তারপর শরীর অসুস্থ হয়। পৃথিবীতে একটিমাত্র পদ্ধতি যা মনকে শান্ত ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, সেটি হলো যোগ। তাই আমাদের ভারতীয় পরম্পরার তখন প্রতিটি ব্যক্তি যখন সুস্থ হবে, তখন একটি সুস্থ পরিবার আমরা পেতে পারি। প্রতিটি পরিবার যখন সুস্থ হবে, তখন একটি সুস্থ গ্রাম/শহর পেতে পারি। প্রতিটি গ্রাম ও শহর যখন সুস্থ হবে। তখন আমরা সুস্থ দেশ পেতে পারি। এভাবে প্রতিটি দেশ যখন সুস্থ হবে, তখন আমরা সুস্থ বিশ্ব পেতে পারি। মানুষ যখন মানসিক ও শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকে, তখন অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। আমরা ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি যোগাভ্যাসের মাধ্যমে। এর ফলে পাপাচারের পরিমাণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে কমতে থাকবে।

যোগ এমন একটি পদ্ধতি যা, মনের দুর্বলতা, ভীরুতা ও শারীরিক অক্ষমতা দূর করে। তাই এই সবকিছু যখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তখন একটি সুস্থ পৃথিবী পেতে পারি। এছাড়া আমরা দেখেছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিছু মানুষ অর্থ এবং দুমুঠো খাবারের বিনিময়ে ধর্ম পরিবর্তন করেছে বা মানুষের উপর আধিপত্য করেছে। কিছু মানুষ গলায় তলোয়ার ঠেকিয়ে মানুষের উপর রাজ করেছে। কিন্তু তারা বিদেশি বর্বর জাতি, তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা চলে না। বিশ্বের প্রতি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো— যোগ। আমরা বিশ্বের মধ্যে সেই জাতি, যারা বিশ্বকে যোগাভ্যাসের বার্তা প্রদানের মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার দিশা দেখিয়ে এই ভারতীয় সংস্কৃতি সারা পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করছে। ■

নাগপুরে কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ দ্বিতীয়'র সমাপন সমারোহ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ দ্বিতীয়'র সমাপন সমারোহ গত ১০ জুন নাগপুরের রেশিমবাগ ময়দানে সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, শ্রীক্ষেত্র গোদাবরী ধামের পীঠাধীশ মহন্ত শ্রীরামগিরি মহারাজ, বর্গের সর্বাধিকারী ইকবাল সিংহ, বিদর্ভ প্রান্ত সঙ্ঘচালক দীপকজী তামশেট্টীওয়ার এবং নাগপুর মহানগর সঙ্ঘচালক রাজেশজী লোয়া।

বর্গের সর্বাধিকারী ইকবাল সিংহ মঞ্চাসীন অতিথিদের পরিচয় করান। সরসঙ্ঘচালকজী রামগিরি মহারাজকে মাল্যভূষিত করেন। নাগপুর মহানগর সঙ্ঘচালক অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত স্বামী সত্যপ্রকাশানন্দজী মহারাজ, পদ্মভূষণ ড. কৃষ্ণাজী এল্লা, পিরামল গ্রুপের আনন্দজী পিরামল, জিন্দাল গ্রুপের প্রণব জিন্দাল, নাম ফাউন্ডেশনের মলহার পাটেকর (নানা পাটেকরের পুত্র) এবং নাম ফাউন্ডেশনের মুখ্য অধিকারী গণেশজী থোরাতের পরিচয় করিয়ে ধন্যবাদ জানান।

কার্যকর্তা বিকাশ বর্গের কার্যবাহ অশোক আগরওয়াল বর্গের প্রতিবেদনে জানান যে, ৩৪ টি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার প্রতিনিধিত্বকারী ৯৩৬ জন শিক্ষার্থী বর্গে অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ৭৪ জন বিদ্যার্থী, ১১১ জন শিক্ষক, ২৭ জন ইঞ্জিনিয়ার, ৩৯ জন উকিল, ২৮ জন শ্রমিক, ৪ জন সাংবাদিক, ২৬৩ জন সঙ্ঘ প্রচারক ও পূর্ণকালিক কার্যকর্তা, ৬৫ জন ছোটো ব্যবসায়ী, ১১ জন ছোটো শিল্পপতি, ১৪ জন অধ্যাপক/প্রিন্সিপাল, ৯জন ডাক্তার, ৫২ জন কৃষক, ১৩৬ জন সরকারি কর্মচারী, ১০১ জন স্ব-রোজগারি এবং ২ জন অন্য পেশার।

শিক্ষার্থীদের শারীরিক প্রদর্শনের পর পূজ্য রামগিরি মহারাজ তাঁর ভাষণে বলেন, ভারত যুদ্ধের ভূমি নয়, বরং বুদ্ধের ভূমি। বছরের পর বছর ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণ হয়ে এসেছে কিন্তু ভারতের সাধু-সন্ন্যাসী আর ধর্মাত্মা বীর যোদ্ধারা তা রক্ষা করার মহান কাজ করে চলেছেন। সংস্কার, সমর্পণ ও সামাজিক সমতার বোধ পারিবার থেকে নির্মাণ হয়ে থাকে। পিতৃবচন পালনকারী শ্রীরাম আমাদের আদর্শপুরুষ। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধারণা তাঁর জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গে মানুষের সামনে রেখেছেন। তিনি সামাজিক সহমর্মিতার ভাব সমাজজীবনে ব্যাপ্ত করেছেন। সরসঙ্ঘচালক তাঁর ভাষণে বলেন, বাবাসাহেব আম্বেদকর বলতেন, যে কোনো বড়ো পরিবর্তন হওয়ার আগে সমাজে আধ্যাত্মিক জাগৃতি শুরু হয়। আমাদের দেশে এর কমই হয়ে এসেছে। আমাদের সমাজ বিবিধতাতে পরিপূর্ণ, কিন্তু সকলের মূল একই। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলা, সকলের কথার মান্যতা দেওয়া উচিত। যখন একথা আমরা ভুলে গেছি, তখনই সমাজে বিকৃতি এসেছে। আমরা আমাদেরই ভাই-বোনেদের অচ্ছুত মনে করে দূরে সরিয়ে রেখেছি। আমাদের ধর্মগ্রন্থে এবিষয়ে কোনো সমর্থন নেই। ছুঁতমার্গের ভেদভাব এখন অচল হয়ে গিয়েছে। এখন সমাজে একাত্মতার প্রয়োজন। সমাজে অন্যায়ের কারণে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যারা সমাজের অন্যায়ের কারণে আমাদের থেকে দূরে চলে গিয়েছে, তাদের সঙ্গে নিতে হবে, তাদের প্রতি সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে।

পরিবেশ সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টি

তিনি বলেন, এবছর প্রচণ্ড গরম পড়েছে। শৈলশহরগুলোতেও গরম অনুভূত হচ্ছে। ব্যাঙ্গালুরুর মতো মহানগরে জলসংকট শুরু হয়েছে। হিমবাহ গলতে শুরু করেছে। পরিবেশ সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় পরম্পরায় ব্যক্তিকে পরিবেশ- বান্ধব মনে করা হয়। আমাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি বসুধৈব কুটুম্বকম। প্রকৃতি আমাদের মা। এই ভাবনায় নিজেকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের উপযোগী করে তুলতে হবে।

সামাজিক সমরসতা, পরিবেশ রক্ষা, স্ব-আধারিত ব্যবস্থা, পরিবার প্রবোধন এবং নাগরিক কর্তব্য— এই পঞ্চ পরিবর্তনের জন্য সঙ্ঘ কাজ শুরু করেছে।

উন্নতি বিষয়ে ভারতীয় দৃষ্টি

আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রাচীন জ্ঞানের সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নতির মানদণ্ড তৈরি করতে হবে। এরজন্য দেশে শান্তির পরিবেশ আনতে হবে। অশান্তির পরিবেশে কোনো দেশ এগিয়ে যেতে পারে না। মণিপুর একবছর থেকে জ্বলছে। মনে হচ্ছে প্রাচীন সংস্কৃতি শেষ হয়ে গেছে। ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করে মণিপুরকে অশান্ত করা হয়েছে। এবিষয়ে চিন্তাভাবনা করে তার সমাধান করতে হবে।

নির্বাচন প্রক্রিয়া

সহমত নির্মাণের প্রক্রিয়া হলো নির্বাচন। সংসদে যেকোনো প্রশ্নের ভালো-মন্দ দুদিকেরই আলোচনা হয়ে থাকে। এটি একটি ব্যবস্থা। বাস্তবে, সহমত নির্মাণের জন্যই সংসদ। কিন্তু নির্বাচনে পরস্পরের প্রতি কটুবাক্য, প্রযুক্তির দুরুপযোগ এবং মিথ্য প্রচার— এগুলি ঠিক নয়। বিরোধী শব্দ প্রয়োগ না করে প্রতিপক্ষ বলা উচিত। নির্বাচনের শেষে সমস্ত রকম আবেশ থেকে মুক্ত হয়ে সকলে মিলে দেশের সমস্যার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

ইটাহারে ড. মেঘনাদ সাহা কলেজে সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগে আলোচনা সভা

ভারতীয় দার্শনিক গবেষণা পষিদের অনুমোদনে গত ১০ জুন উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারে ড. মেঘনাদ সাহা কলেজে সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগে 'ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা এবং উচ্চশিক্ষা' বিষয়ক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ব্রজকিশোর, গৌড়বঙ্গ

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান ড. চন্দন ভট্টচার্য, দর্শন বিভাগীয় অধ্যাপক পূর্বায়ন ঝা এবং রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রশান্ত মহলা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলেজের উপাধ্যক্ষ ড. মুকুন্দ মিশ্র-সহ অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অতনু আঢ্য, সামসী কলেজের অধ্যাপিকা নীলিমা সরকার, কালিয়াগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক শ্যামল বিশ্বাস, ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজের অধ্যাপক ড. সমীর আফতার প্রমুখ। অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ছাত্রীদের সমবেত গানের মাধ্যমে সভার শুভারম্ভ হয়। সভায় ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। ৪০জন অধ্যাপক-গবেষক অনলাইন ও অফলাইনে প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনায় উঠে আসে বেদ-উপনিষদের বাণী, রামায়ণ-মহাভারত, গীতার বিষয়। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপক জয়গোপাল বিশ্বাস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক দারিন সরকার।

হালিশহর শ্রীনিগমানন্দ মঠে সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে দ্বাদশ দিবসীয় সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বর্গ।

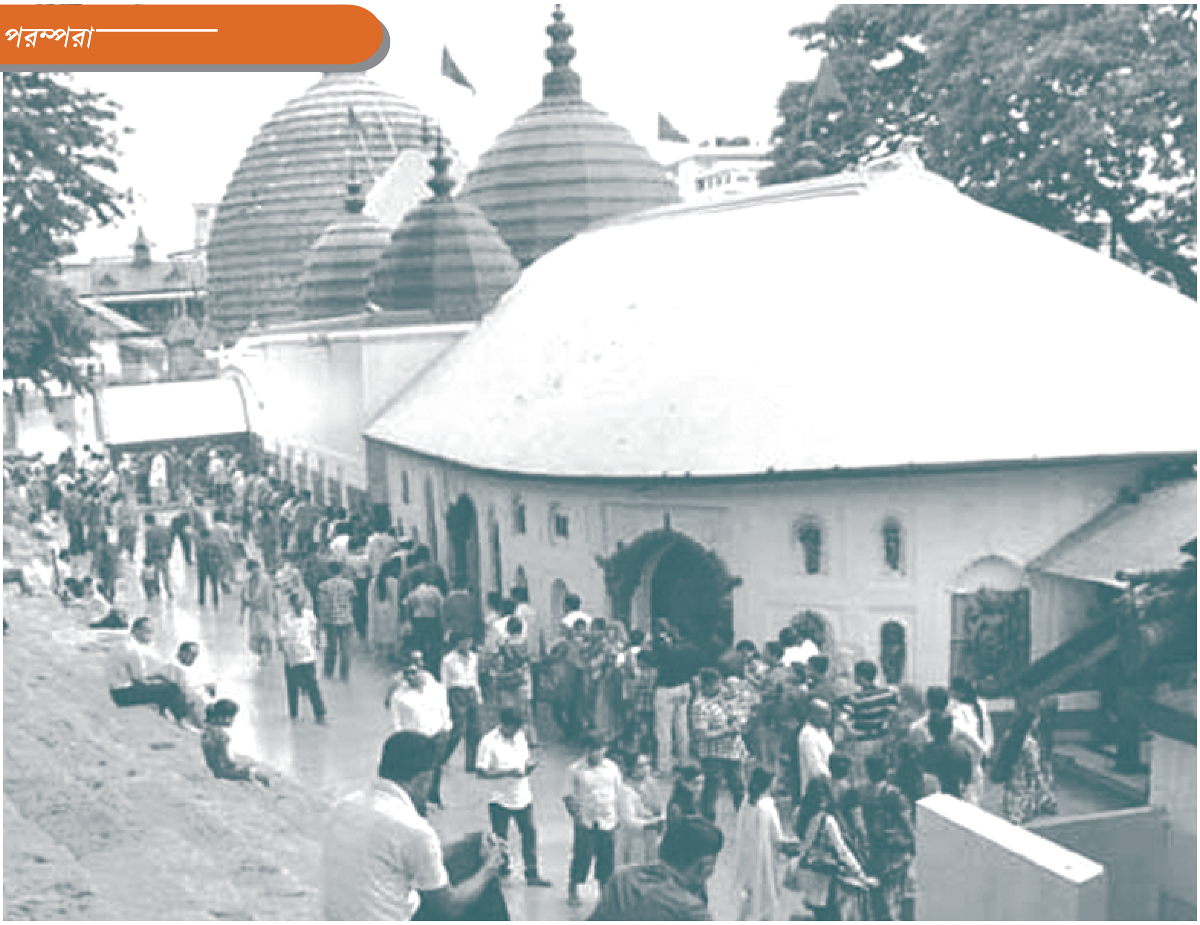

অম্বুবাচী : নববর্ষা বরণ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

হিন্দুদের প্রতিটি পূজা অনুষ্ঠানই ঋতুভিত্তিক। ঋতুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই হয় বেশিরভাগ অনুষ্ঠান। এই সব পূজা অনুষ্ঠানের আয়ত্ত একটি বৈশিষ্ট্য— এগুলি সবই দ্বিমাত্রিক। প্রতিটি অনুষ্ঠানেরই দুটি দিক। তার একটি ব্যক্ত, অন্যটি প্রচ্ছন্ন। এই দুটি দিকের একটি হলো আধ্যাত্মিক, অন্যটি ব্যবহারিক। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে ধর্মের ব্যাপারটি এবং এই দিকটি অবশ্যই প্রত্যক্ষ বা ব্যক্ত। ব্যবহারিক দিকটির সঙ্গে বেশিরভাগ সময়ই জড়িয়ে থাকে স্বাস্থ্য ও জীবনচর্যার বিভিন্ন দিক। শাক্ত আচারের সঙ্গে যুক্ত এবং বিশেষ করে বাঙালি, অসমিয়া এবং উত্তরপূর্ব ভারতের অধিবাসীদের অন্যতম অনুষ্ঠান অম্বুবাচী সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়।

অম্বুবাচীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেবী কামাখ্যার বিশেষ পূজা, উৎসব, মেলা। অন্যদিকে এর সঙ্গে আছে বেশ কিছু বিধিনিষেধ পালনের নির্দেশ। এইসব নিয়ম-বিধি, নির্দেশ বা আচার অনুষ্ঠানের অন্যতম রান্না করা কোনও খাবার না খাওয়া। তিনদিন ফলমূল খেয়ে প্রায় আধবেলা উপোস করেন বিশেষ করে হিন্দু বাঙালি বিধবারা। ব্রাহ্মণ ও যতীরা প্রায় একই ভাবে পালন করেন অম্বুবাচী। অথচ স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে রান্না বন্ধ বা ভাত ইত্যাদি খাওয়া বর্জনের কোনো নির্দেশই নেই বলে মনে করেন পণ্ডিত মণ্ডলী।

বিশেষ করে হিন্দু বাঙালি প্রায় অর্ধাশনে থেকে অম্বুবাচী পালন করলেও, যে কারণে এই উৎসবের বা আচরণবিধির সূচনা সেটি কিন্তু প্রায় উপেক্ষিতেই থেকে যায়। সমাজবিজ্ঞানী এবং বুধমণ্ডলীর ধারণা, অম্বুবাচী প্রকৃতপক্ষে একটি কৃষি-উৎসব। আর সেই কারণেই পৃথিবী এসময় রজঃস্বলা হয় বলে ধরে নিয়ে এই তিনদিন বন্ধ থাকে হলকর্ষণ। অন্য কথায় বছরের এই তিনটি দিন হলো কৃষকের ছুটির দিন।

বর্ষার আগমনকে নির্দেশ করে অম্বুবাচী। এই শব্দটির আভিধানিক একটি অর্থ হলো জল বা জলসিক্ত। যদিও এর অন্য অর্থে একটি বিশেষ তিথি পালনের শাস্ত্রীয় বিধির কথা বলা হয়েছে। বঙ্গদেশে সাতই আষাঢ় থেকে তিনদিন এবং ওড়িশায় জ্যেষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে তিনদিন সময় কালকে অম্বুবাচী বলা হয়। ওড়িশায় অবশ্য এর নাম রজো উৎসব। সাধারণভাবে এই সময়ের আশেপাশেই বঙ্গদেশে বর্ষা আসে। যে কারণে অম্বুবাচীকে বর্ষা বরণের অনুষ্ঠান বলেও চিহ্নিত করা হয়। আর তাই এই উৎসব মূলত কৃষককুলের জন্য, এমনটাই মনে করেন সমাজবিজ্ঞানীরা। অথচ বাঙালি হিন্দুর কাছে এটি হলো বিধবাদের অতি অবশ্য পালনীয় একটি ব্রত। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং যতী সন্ন্যাসীদের অনেকে এই

তিনটি দিন পালন করেন বিধবাদের মতোই পরমনিষ্ঠায়।

সাধারণভাবে অম্বুবাচীতে রান্না করা বা উনুন জ্বালানো হয় না। এমনকী অগ্নিপক্ক বা রান্না করা কোনো খাবারও খান না বিধবারা। অনেকে অম্বুবাচীর আগেই তৈরি রুটি, লুচি, খই, চিঁড়ে, মুড়ি ইত্যাদি এবং মরসুমি ফল খেয়ে এই তিনটি দিন কাটান। অতি গোঁড়ারা গুড় চিনিও বর্জন করেন নিষিদ্ধ বিধায়। এই তিনদিন তাঁদের খাদ্য কেবলমাত্র কাঁচা দুধ ও ফলমূল। বস্তুত এই তিনটি দিন পুরো না হলেও প্রায় অর্ধ-উপবাসে কাটে হিন্দু বাঙালি বিধবাদের।

অথচ আশ্চর্য, পণ্ডিতরা অনেক খুঁজেও প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রগুলিতে খাদ্য বর্জনের এ জাতীয় কোনো নির্দেশ পাননি। স্মৃতিশাস্ত্র গুলিতে অম্বুবাচীর সময় সমস্ত চাষবাস বন্ধ রাখার কথাই শুধু আছে। পঞ্জিকার অবশ্য একটি বচনে যতী, ব্রতী, বিধবা এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে অম্বুবাচীতে রান্না খাবার না খাওয়ার কথা আছে। কিন্তু এই বচনের উৎস উল্লেখ করা হয়নি কোথাও। রঘুনন্দন বা অন্য স্মৃতিকারদের গ্রন্থেও এর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বাংলার বৃহস্পতি রায়মুকুট শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য এবং ওড়িশার গদাধর প্রমুখ স্মার্ত পণ্ডিত-প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে অম্বুবাচীর বিস্তৃত বিবরণ আছে। প্রাচীন প্রমাণের উল্লেখ করে এঁরা অম্বুবাচীর সময় হলকর্ষণ, বীজবপন, ভূখনন ইত্যাদি নিষিদ্ধ বলেছেন। অর্থাৎ এই সময়ের কৃষকের ছুটির কথা বলা হলেও কোনো জায়গাতেই বিশেষ করে বিধবাদের রান্নাখাবারের নিষেধের কথা নেই।

ষোড়শ শতকের রঘুনন্দনের আগের যুগের স্মৃতিকথা তো গোবিন্দানন্দজী স্পষ্ট বলেছেন, 'আধুনিকরা বলেন, এই সময় পৃথিবী অপবিত্র হয়। তাই যদি হয় তাহলে তো খাওয়া-দাওয়া সবই নিষিদ্ধ হত।' এর থেকে মনে হয়, অন্তত ষোড়শ শতকেও অম্বুবাচীতে রান্না খাবার খাওয়ায় কোনো মানা ছিল না। এটি সম্ভবত পরবর্তী যুগের লোকাচার।

গোবিন্দানন্দরও বহু আগে রচিত দেবী ভাগবতে আছে—

অম্বুবাচ্যাং ভূখননং জলশৌচাদিকঞ্চ যে।

কুর্বন্তি ভারতবর্ষে ব্রহ্মহত্যাং লভন্তিতে।। (৯।৩৪।৪৯)

এখানেও অম্বুবাচীতে ভূ-খনন বা জলাশয়ে শৌচকর্ম করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু খাদ্য সম্পর্কে কোনো নির্দেশ নেই। এরই সূত্রে কৃত্যতত্ত্বে আষাঢ়কৃত্য সম্পর্কে রঘুনন্দনের বিধান,—

তত্র অধ্যয়নং বীজবপনং ন কার্যং'।

এসব থেকেই সমাজ ও নৃ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আদিতে অম্বুবাচী ছিল শুধুই কৃষি উৎসব। ওই তিন দিন কৃষকদের ছুটি দিয়ে নববর্ষাকে স্বাগত জানানো হতো। নানা আমোদ প্রমোদ, নৃত্য-গীত ইত্যাদি লোকানুষ্ঠান। একদা ছিল যা বর্ষাবন্দনা ও কৃষির উৎসব, কালে সম্ভবত পুরোহিততন্ত্রের বিধানে তা পরিণত হয় প্রায় উপবাসের মতো এক কৃচ্ছ্রসাধনে।

অম্বুবাচীর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে দেবী কামাখ্যার কাহিনি। গুয়াহাটি থেকে তিন-চার কিলোমিটার দূরে ব্রহ্মপুত্রনদের বাঁ তীরে নীলাচল, নীল বা নীলকূট পাহাড়ে রয়েছে দেবী কামাখ্যার মন্দির। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামাখ্যার নামেই এই মন্দির। দশমহাবিদ্যার এক বিদ্যা— দেবী কামাখ্যা। একান্ন শাক্ত পীঠের অন্যতম এই দেবীপীঠ। কালিকা পুরাণ মতে, কুব্জিকা পৃষ্ঠে পড়েছিল বিষ্ণুচক্রে খণ্ডবিখণ্ডিত সতীর যোনিদেশ। তারই ফলে পাহাড় নীল হয়ে ওঠে। যোনি দেশের ভারে কুব্জিকা পাহাড় মাটিতে প্রোথিত হলে ব্রহ্মা তাকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। তাঁর চেষ্টায় পাহাড়ের চূড়াগুলিই শুধু উত্থিত হয়।

কালিকা পুরাণেই আছে, দেবী কামাখ্যাই প্রকৃতি রূপে সমস্ত জগৎকে নিয়োজিত করছেন। 'কামার্থমাগতা যন্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ'। শিবের সঙ্গে কাম চরিতার্থ করার জন্য মহামায়া এই মহাগিরিতে এসেছিলেন বলেই এই নীলকূট পাহাড়ে নির্জনস্থা দেবী কামাখ্যা নামে পরিচিত। দেবী কামাখ্যা কামিনী, কামদা, কামা, কান্তা ও কামাদি দায়িনী। ইনি কামাঙ্গনাশিনী— তাই কামাখ্যা নামে পরিচিত।

পৃথিবীপুত্র নরকাসুর প্রথম তাঁর আরাধ্যা কামাখ্যা দেবীর মন্দিরটি তৈরি করেন। ১৫৬৫-তে একটি সংস্কার করেন রাজা নারায়ণ।

দেবী কামাখ্যার সঙ্গে হয় কামেশ্বরের বিবাহ। সেই উৎসব স্মরণ করেই কামাখ্যায় পৌষ মাসে হয় পৌষরিয়া উৎসব, বসন্তে বাসন্তী উৎসব, আষাঢ়ে অম্বুবাচী এবং শরতে দুর্গাপূজা।

অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে কামাখ্যায় বসে মহামেলা। দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ আসেন তখন এখানে। আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে সূর্য যখন আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদ ভোগ করেন সেই সময় অর্থাৎ তিনদিন কুড়ি দণ্ড সময়কাল অম্বুবাচী নামে খ্যাত। অম্বুবাচীর সঙ্গে কামাখ্যার মহামেলা জড়িয়ে রয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে। অম্বুবাচীর চারদিন দেবী মন্দির বন্ধ থাকে। চারদিন পর মন্দির আবার খোলা হয়। সে কারণেই দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষের এই অম্বুবাচীর মহামেলা চলে আরও কয়েকদিন। সব মিলিয়ে কামাখ্যায় অম্বুবাচী মেলা আজ এক সর্বভারতীয় উৎসব। □

With Best Compliments from -

A Well Wisher

রাম-রাজ্যের ধারণা

ড. অনিল কুমার ঘোষ

রাম-রাজ্য শব্দবন্ধটি একটি আদর্শ অবলম্বন করে রাজ্য শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়। কোনো দেশের বা রাজ্যের প্রজাপালন ও অনুশাসন প্রক্রিয়া যখন জনহিতকর ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে তখন সেই দেশের শাসনব্যবস্থাকে রাম-রাজ্য নামে অভিহিত করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও রাম-রাজ্য শব্দটির সঙ্গে রামের নাম যুক্ত থাকার সুবাদে শ্রীরামের রাজ্য শাসন প্রণালী এবং শ্রীরামের শাসনে কোশল রাজ্যের মানুষজনের অবস্থা কেমন ছিল তা জানার প্রয়োজন রয়েছে।

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম একজন আদর্শ পুরুষ, একজন প্রজাকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ রাজা, যাঁর জীবনশৈলী অনুসরণ করে সমাজে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, দেবদ্বিজে ভক্তি ও সেবা, শত্রুর প্রতিও সমান মানবিক মূল্যবোধের প্রদর্শন, ধর্ম, অর্থ, কাম— এই ত্রিবর্গ অর্জন, সর্বোপরি রাজা হিসেবে প্রজাপালন ও প্রজা কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়।

ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের আর্তি দেখে বাল্মীকির মুখে ধ্বনিত হয়েছিল প্রথম শ্লোক— 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধী কামমোহিতম্'।। (১.২.১৫)। জগতের প্রথম কবিকে মহান ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কাব্য রচনায় প্রয়াসী করতে দেবর্ষি নারদ এলেন বাল্মীকি কুটিরে। তখন মহর্ষি বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করেন— 'কঃ নু অস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কঃ চ বীর্যবান্। ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ।। চরিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ। বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থ কশ্চেক প্রিয়দর্শন।। আত্মবান্ কঃ জিতক্রোধঃ দ্যুতিমান্ কঃ অনসূয়কঃ" (১.১.২-৪)। সাম্প্রতিক সময়ে এই পৃথিবীতে কে এমন আছেন যিনি গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, চরিত্রের মধ্যে সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী, কে আছেন বিদ্বান, সমর্থ এবং প্রিয়দর্শী। কে আছেন আত্মবান, জিতক্রোধ, দ্যুতিমান, কে আছেন যিনি অন্যের প্রতি হিংসা বা ঈর্ষা করেন না অর্থাৎ অনসূয়ক। উত্তরে নারদ বলেছিলেন— 'ইক্ষাকু বংশপ্রভবঃ রামনাম জনৈশ্রুতঃ। নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান ধৃতিমান বশী।।' (১.১.৮)। আপনি যেমন চাইছেন তার চেয়েও বেশি, তিনি ঋজু প্রকৃতির, মহাবীর্যমান, দ্যুতিমান্, ধৃতিমান, ইন্দ্রিয় যার বশীভূত— এমন ব্যক্তিত্ব হলেন ইক্ষাকু বংশের প্রভাবান রাম।

শ্রীরামের রাজ্য শাসন

বাল্মীকি রামায়ণে বালকাণ্ডে নারদমুনি শ্রীরামের গুণাবলী সম্পর্কে বলতে গিয়ে রামের শাসন সম্পর্কে বলছেন— "প্রহৃষ্টমুদিতঃ লোকঃ তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্মিকঃ। নিরাময়ঃ হি অরোগশ্চ দুর্ভিক্ষ ভয়বর্জিতঃ'। ১.১.৯০। অর্থাৎ শ্রীরাম রাজা হবার পরে পরেই সারা বিশ্ব আনন্দিত, সুখী হলো, তাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার কারণে তারা সন্তুষ্ট। রাজ্যের মানুষ সকলেই ন্যায়ের পথে চলতে থাকেন। রাজ্যে কোনো কষ্ট যন্ত্রণা, রোগ বা দুর্ভিক্ষের ভয় ছিল না।

প্রজাদের আকাঙ্ক্ষা কী? স্ত্রী, পুত্র-কন্যা-সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করা, তারই প্রতিফলন এই শ্লোকে---"ন পুত্র মরণং কিঞ্চিৎ দ্রক্ষন্তি পুরুষাঃ ক্বচিৎ। নার্যশ্চ অবিধবাঃ নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতা"।। ১.১.৯১।। শ্রীরামের শাসনকালে কোথাও ব্যক্তি তার পুত্রের মৃত্যু দেখেনি বা কোনো মহিলা তার স্বামী হারিয়ে বিধবা হয়নি। সর্বক্ষণ তারা সতী নারী হয়ে স্বামী অনুগামী ছিল।

পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি বজায় রাখতে শ্রীরামের সুশাসনে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশও সহায়ক হয়ে যায়, তারই প্রতিফলন দেখি বালকাণ্ডের প্রথম সর্গের ৯২নং শ্লোকে। যেখানে বলা হয়েছে— রামের র‍্যাজ্য আগুন, জল, বাতাস, রোগ, ক্ষুধা ও চোরের ভয় ছিল না। এই শ্লোকে প্রতিফলিত হয়, প্রকৃতি ও সমাজ শ্রীরামের সুশাসনে প্রজাদেরকে তাদের সুখে ও শান্তিতে জীবনযাপনে সহায়তা দিচ্ছে।

শ্রীরামের সুশাসনে গ্রাম শহর নির্বিশেষে প্রজাসাধারণের খাদ্য, বিত্ত সম্পদ তাদের সুখ শান্তিতে স্থায়ী করেছে। 'নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি ধনধান্যযুতানি চ।। ১.১.৯৩।। নিত্যং প্রমুদিতাঃ সর্বে যথা'। অর্থাৎ সব শহর ও গ্রামে সকলে ছিল খাদ্যশস্য ও সম্পদে বিত্তশালী, লোকেরা সুখে বাস করত যেন তারা কৃতযুগে বাস করছে। কৃতযুগ হলো সত্যযাগের অপর নাম, যে যুগে মানুষের জীবন ছিল স্বর্গীয় আনন্দ ও সুখে ভরা। মানুষের জীবনকাল ছিল সহস্রাধিক বছর এবং তা ছিল নিরুপদ্রব ও নির্ভীক জীবন যাপনের।

বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ১২৮ সর্গের ৯৫ ও ৯৮ থেকে ১০৬নং শ্লোক পর্যন্ত শ্রীরামের রাজ্য শাসন প্রণালী এবং সুশাসনের ফলাফল সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। শ্রীরাম বনবাস থেকে ফিরে এসে সিংহাসনে

আরোহণ করেন এবং ১১ হাজার বছর রাজত্ব করেন যার উল্লেখ পাওয়া যায় এই শ্লোকে— ‘রাজ্যং দশসহস্রাণি প্রাপ্য বর্ষাণি রাঘবঃ। শতাশ্বমেধানাজহ্রে সদশ্বান্ ভূরিদক্ষিণান্।। (৯৫)। অর্থ হলো— শ্রীরঘুনাথ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে একাদশ সহস্র বছর রাজ্য শাসন করলেন এবং শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। সেই সকল যজ্ঞে উত্তম যজ্ঞাশ্ব মোচন করা হয়েছিল; যজ্ঞের ঋত্বিকগণকেও প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করা হয়েছিল।

৯৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে— শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে কোনোদিন বিধবাদের বিরহ বিলাপ শোনা যায়নি। অর্থাৎ রামের সুশাসনে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে অকালমৃত্যু রোধ করা সম্ভবপর হয়েছে। প্রজাসাধরনের জীবনে সর্পাদি শ্বাপদের ভয় অথবা রোগভয়ের কখনও প্রাদুর্ভাব হয়নি। পরের শ্লোকে বলা হয়েছে— সমগ্র রাজ্যের কোথাও চোর ডাকাতের নাম পর্যন্ত শোনা যেত না। রাজ্যে কেউ অনর্থকারী কার্যে লিপ্ত হতো না, কিংবা বৃদ্ধগণের কদাপি নবীনদের জন্য অন্ত্যেষ্টি সৎকার করার প্রয়োজন পড়ত না। এখানেও একইভাবে অকালমৃত্যু রোধের কথায় বলা হলো। নির্ভীক জীবনচর্যা মানুষকে শান্তিতে ধর্মাচরণ করতে সক্ষম করে তুলেছিল যা আমরা ১০০ শ্লোকে দেখতে পাই— ‘‘সর্বং মুদিতমেবাসীৎ সর্বো ধর্মপরোঽভবৎ। রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যসিংসন্ পরস্পরম্।। যার অর্থ হলো— সকলে সদা আনন্দে থাকত ও ভয়মুক্ত প্রজাসাধারণ জীবনচর্যায় ধর্মাচরণ শুরু করে। পরের শ্লোকে আছে— শ্রীরামচন্দ্রের শাসনকালে প্রজাগণ সহস্র বৎসর যাবৎ জীবিত থাকত, সহস্র পুত্রের জনক হতো এবং নীরোগ ও শোকশূন্য হয়ে বসবাস করত। ‘‘রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ। রামভূতং জগদভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।। যার অর্থ হলো— রারাজ্যে প্রজাবর্গের মুখে মুখে কেবল রাম, রাম— নাম এবং রামকথা শোনা যেত। অখিল রাজ্য রামময় হয়ে থাকত। কতকাল আগের রচনা, কতকাল আগের ঘটনা তবু তা কতখানি নির্মল, পবিত্র ও হৃদয়স্পর্শী তা এই শ্লোক থেকেই জানতে পারি। ‘‘নিত্যমূলা নিত্যফলাস্তরবস্তত্র পুষ্পিতাঃ। কামবর্ষী চ পর্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুত।। ১০৩ যার অর্থ হলো— তথায় বৃক্ষরাজি সর্বত্র ফলমূল পত্র-পুষ্পাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। মেঘ প্রয়োজনানুসারে বর্ষিত হতো এবং পবন সদা সুখকর হয়ে প্রবাহিত হতো। রামশাসনে প্রকৃতিও যে সাধারণের জীবনচর্যায় সহায়তা দিচ্ছে তারই পুনরুল্লেখ আমরা এই শ্লোকে পেয়ে থাকি। ‘‘ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা লোভবির্জিতাঃ। স্বকর্মসু প্রবর্তন্তে তুষ্টাঃ স্বৈরেব কর্মভিঃ।। ১০৪। যার অর্থ হলো— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চতুর্বর্ণের প্রজাই নির্লোভ ছিলেন। সকলেই স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের কর্তব্য পালনে সুপ্রসন্ন এবং নিজ নিজ কর্মে রত থাকতেন। আসন্ প্রজা ধর্মপরা রামে শাসতি নানৃতাঃ। সর্বে লক্ষণাসম্পন্নাঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ।। ১০৫। যার অর্থ হলো— শ্রীরামচন্দ্রের শাসনে সকলে ধর্মাচরণে তৎপর ছিলেন। কেউ কখনও মিথ্যা ভাষণ করতেন না। প্রজাগণ সুলক্ষণসম্পন্ন ছিলেন এবং ধর্মপরায়ণ হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরের শ্লোকে আছে— ‘দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ। ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমান রামো রাজ্যমকারয়ৎ।। ১০৬। যার অর্থ হলো— এইরূপে ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র একাদশ সহস্র বর্ষকাল রাজত্ব করেছিলেন।

শ্রীরামের সুশাসন ও প্রজাহিতৈষণা শ্রীরামের সদাশয় মননশৈলী এবং সুদৃঢ় চরিত্রের প্রতিফলন। শ্রীরাম যখন বনবাসে চিত্রকূট পর্বতে আসীন তখন মামাবাড়ি থেকে ফিরে এসে ভরত অযোধ্যা থেকে চিত্রকূটে গেছেন দাদাকে ফিরিয়ে আনতে। দৃঢ়চরিত্রের অধিকারী শ্রীরাম পিতৃসত্য পালন না করে যে বাড়ি ফিরবেন না একথা সুস্পষ্টভাবে ভরতকে জানিয়ে দিয়েছেন, প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেম অক্ষুণ্ণ রেখেই। ভাইয়ের আবদার মেটাতে নিজের পাদুকাজোড়া দিয়ে খালি পায়ে বনবাসের দিনগুলি কাটিয়েছেন। সেইসঙ্গে রাজ্য সাসনের সুপরামর্শ দিয়েছেন— দেব দ্বিজে ভক্তি শ্রদ্ধা, বরিষ্ঠজনের পরামর্শ মাথা পেতে নেওয়া, রাজকোষাগার ভরিয়ে রাখার উদ্দেশ্য প্রজাদের অসময়ে সহায়তা দেওয়া ইত্যাদি। সুশাসনের ভিত্তি যে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি সমান নজর দেওয়া, তার প্রতিফলন দেখি— ‘কচ্চিত্বে দয়িতা সর্বে কৃষি গোরক্ষজীবিনঃ...’ কৃষক গোচারক প্রভৃতিদের অর্থনৈতিক সুরক্ষার দিকে নজর দেবার পরামর্শ দেন। কেন নজর দেওয়া দরকার সেকথাও বলেছেন, কৃষি ও গোরক্ষজীবীরাই সমাজ ও সভ্যতাকে অগ্রগতির পথে চালিত করে।

পিতৃভক্তির কথাতে আমরা শ্রবণকুমারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামের পিতৃভক্তির কথা শুনি। যখন তিনি মাতা কৈকেয়ীর কাছে শুনলেন চোদ্দ বছর বনবাসের কথা, তখন আর তা বাবার কাছে যাচাই করার কথা ভাবেননি— ‘‘দণ্ডকারণ্যম্ এষঃ অহম্ ইতঃ গচ্ছামি সত্বরঃ। আবিচার্য্য বিতুর্বাক্যং সমা বস্তুং চতুর্দশ।। ২.১৯.১১। বাবা-মায়ের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা কতখানি
নিষ্ঠার সঙ্গে থাকলে এরকম বলা যায়।

উপচিকীর্ষা শ্রীরামের চরিত্রের এক মহিমান্বিত রূপ। যুদ্ধে রাবণবধের পর বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে স্থাপন করে শ্রীরাম তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। শ্রীরামকে বিভীষণ রাবণ বধের বিষয়ে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। এই উপকারের কথা তিনি স্মরণে রেখেছিলেন। তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ সামাজিক মানুষের কাছে স্মরণীয়। তাই তিনি বলছেন, লক্ষ্মণ, রাবণের মৃত্যুর পর লঙ্কাপুরী অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে, এ অবস্থায় আমি চাই বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করুন, তুমি তার ব্যবস্থা কর— ‘এষ মে পরমঃ কামো যদিমং রাবণানুজম্।।(৬.১১২.১০)। লঙ্কায়াং সৌম্য পশ্যেয়ম্ অভিষিক্তং বিভীষণম্।

মিত্রবৎসল রাজা শ্রীরাম। শৃঙ্গবেরপুর ছিল সে সময় নিষাদ রাজ্য, যার রাজা ছিলেন গুহক, তিনি ছিলেন শ্রীরামের পরম হিতৈষী, সুহৃদ্। বনবাসে প্রথম রাত্রিবাস এই রাজ্যের এক বিশালকায় ইঙ্গুদি বৃক্ষতলে। বন্ধুপ্রীতি যে কতখানি প্রবল ছিল তা অনুমান করা যায় এই শ্লোক থেকে— ‘দিষ্ট্যা ত্বাং গুহ পশ্যামি হি অরোগ্যং-সহ বান্ধবেঃ। অপি তে কুশলং রাষ্ট্রে মিত্রেষু চ ধনেষু চ।(২.৫০.৪২)। বনবাস থেকে ফেরার সময় রাম গুহক রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভোলেননি।

আমরা আজ সবাই রামরাজ্যের কামনা করছি এবং তা তখনই সম্ভবপর হবে, যখন রাজা বা শাসকের চরিত্রে শ্রীরামের চরিত্রের প্রতিস্থাপন এবং প্রজাসাধারণের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপন ও ধর্মাচারণ প্রতিফলিত হবে। □

অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত জমি দখলের কথা বলছেন সাংবাদিকদের।

গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও গাজীপুরে ভয় দেখিয়ে হিন্দুদের জমি দখল করছে পুলিশের আইজি বেনজির

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের জমি ভয় দেখিয়ে নামমাত্র মূল্যে কেনা, কৌশলে বাধ্য করা, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কিংবা ভয় দেখিয়ে দখল করা নতুন কোনো ঘটনা নয়। এভাবে জমি দখলের পর অসহায় অবস্থায় তাদের দেশত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। গন্তব্য ভারত। এই বাস্তবতা এবার আরও ভয়ংকরভাবে সামনে নিয়ে এল সম্প্রতি পুলিশের সর্বোচ্চ কর্মকর্তার হিংস্র থাবার খবর প্রকাশ হয়ে পড়ার ঘটনায়।

খবরে বলা হয়েছে, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজির আহমেদ ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে নিজের এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামে গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরে প্রায় ৬০০ বিঘা জমি কিনেছেন। এসব জমির প্রায় সবই হিন্দুদের। হিন্দু বলছেন, জমি বিক্রি ছাড়া তাদের কোনো উপায় ছিল না। ভয় দেখিয়ে, জোর করে এবং নানা কৌশলে তাদের কাছ থেকে জমিগুলো কেনা হয়েছে। গাজীপুরেও অনুরূপভাবে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের জমি কেনার খবর পাওয়া গেছে। এসব খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বেনজির সপরিবারে সিঙ্গাপুরে পালিয়ে গেছেন।

গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরে গিয়ে জমি বিক্রি করা হিন্দু পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা

বলে জানা গেছে, তাদের জমি কিনতে এক পুলিশ কর্মকর্তাকে নিয়োজিত রেখেছিলেন বেনজির আহমেদ। বেনজির এই জমি নিয়ে সাভানা ইকো রিসোর্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল পার্ক নির্মাণ করেছেন। রিসোর্টের নির্মাণকাজের তদারক করতেন পুলিশ ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের (র‍্যাব) কিছু সদস্য। তাদের দিয়ে তরমুজ চাষ-সহ কৃষিকাজও করানো হয়েছে। নীচুতলার একজন পুলিশ কর্মকর্তা বিষয়টি স্বীকারও করেছেন। তিনি বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নির্দেশ দিলে কিছু করার থাকে না।

বেনজির আহমেদ এসব জমি কেনা ও রিসোর্ট গড়ার কাজটি করেছেন আইজিপি (২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর) ও র‍্যাবের মহাপরিচালক থাকার সময়ে (২০১৫ সালে জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের এপ্রিল)।

জমি বিক্রেতাদের একজন মাদারীপুরের

ফঃ ৫

রাজৈরের উপজেলার বড়োখোলা গ্রামের সরস্বতী রায়ের (বয়স ৬২) কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি কেন জমি বিক্রি করেছেন? প্রশ্ন শুনেই কান্না শুরু করেন সরস্বতীদেবী। তিনি বলেন, 'কত কষ্ট হইরা, সুদে টাহা নিয়া জমিটুকু (৩১ শতাংশ) কিনছিলাম। হেই জমিটুকু দিয়া আসা নাগছে।' জমি কে নিয়েছে? সরস্বতী বলেন, 'বেনজির নিছে।' বেনজির কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বড়ো পুলিশ' বলে শুনেছেন। সরস্বতী রায় আরও বলেন, তার স্বামী নিরঞ্জন রায় ২০ বছর আগে জমিটুকু (৩১ শতাংশ) কিনেছিলেন। বাধ্য হয়ে সেই জমি বিক্রি করতে হয়েছে তাকে। এর বাইরে তাদের বসতবাড়িতে ৫ শতাংশ জমি ও একটি ছোট্ট খুপরি ঘর রয়েছে। নিরঞ্জনবাবু মারা গেছেন। তার ছেলে রঞ্জন রায় দিনমজুরি করে এখন সংসার চালান। তিনি বলেন, বেনজিরের কাছে বিক্রি করা জমির ধান দিয়েই তাদের সারা বছর চলত। এখন চাল কিনে খেতে হয়।

রাজি না হলে জমি যাবে, টাকাও পাবেন না।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে বেনজির আহমেদ, তার স্ত্রী ও তিন মেয়ের নামে এখন পর্যন্ত ৬২১ বিঘা জমির খোঁজ পাওয়া গেছে, যার ৫৯৮ বিঘা গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ও মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলায়। উপজেলা দুটি পাশাপাশি। আর বেনজির পরিবারের জমিও দুই উপজেলার সীমান্ত ঘেঁষা এলাকায়। ওই এলাকার গ্রামগুলো হিন্দু অধ্যুষিত।

বেনজির আহমেদের সাভানা ইকো রিসোর্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল পার্ক নামের এই রিসোর্টে মানুষকে থাকার জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। ১০০ টাকার টিকিট কেটে ঘুরেও দেখা যায়। রিসোর্টটির ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভেতরে খামার, নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থা, শিশুদের খেলার জায়গা ও হেলিপ্যাড-সহ নানা স্থাপনা রয়েছে।

রিসোর্টটি পড়েছে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রাম বৈরাগীরটোলায়। ওই গ্রাম ও পাশের ডোমরাশুর গ্রামে গত ২৯ মে গিয়ে জমি বিক্রেতা পরিবারগুলোর ২৭ জন সদস্যের সঙ্গে কথা হয়। তাদের মধ্যে ২৫ জনই বলেছেন, তারা জমি বিক্রি করতে চাননি, বাধ্য করা হয়েছে। তাদের ভয় দেখিয়েছেন পুলিশের পরিদর্শক তৈমুর ইসলাম।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বৈরাগীরটোলা গ্রামের এক জমি বিক্রেতা হিন্দু বলেন, তার তিন বিঘা পৈতৃক সম্পত্তি জমি কিনে নিয়েছে বেনজিরের পরিবার। পুলিশ কর্মকর্তা তৈমুর ইসলাম বেনজিরের পক্ষে জমির মালিকদের কাছে যেতেন। গিয়ে বলতেন, আমি ভালো অফিসার (কর্মকর্তা), তাই আপনাদের কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। যদি বিক্রি করতে রাজি না থাকেন, তবে জমিও যাবে, টাকাও পাবেন না।

সাভানা ইকো রিসোর্টের কাছে একটি চায়ের দোকানে পাওয়া যায় বৈরাগীরটোলা গ্রামের তরুণ সঞ্জয় বলকে। তিনি বলেন, তার পরিবারের ৩০ বিঘার বেশি জমি জোর করে কিনে নিয়েছেন বেনজির। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন বেনজির র‍্যাবের মহাপরিচালক ছিলেন।

জমি বিক্রেতারা জানান, যারা বিক্রি করতে রাজি হতেন না, তাদের ক্ষেত্রে আরেক কৌশল নিতেন বেনজিরের লোকেরা। সেটি হলো ওই জমির আশপাশের জমি কিনে নিয়ে সেখানে যেতে বাধা দেওয়া। এর ফলে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হতেন সাধারণ মানুষেরা। মাদারীপুর রাজৈরের কদমবাড়ি ইউনিয়নের বড়োখোলা গ্রামের ১২ জন জমি বিক্রেতার সবাই এভাবে তাদের জমি বিক্রিতে বাধ্য করার কথা বলেছেন। বড়োখোলা গ্রামের প্রশান্ত দত্ত বলেন, তারা সচ্ছল। জমি বিক্রি করার কোনো প্রয়োজন তাদের ছিল না। পৈতৃক জমি বিক্রির কোনো ইচ্ছাও তাদের ছিল না। তারা তিন ভাই ২৪ বিঘা জমি বিক্রি করেছেন বাধ্য হয়ে।

জীবিত মালিককে মৃত দেখিয়ে রেজিস্ট্রি

জমি বিক্রেতারা বলেছেন, জমির দলিল দেওয়ার সময় তারা কেউই বেনজির আহমেদ, তার স্ত্রী ও সন্তানদের দেখেননি। কাউকে সাবরেজিস্ট্রি অফিসে, কাউকে রিসোর্টে নিয়ে জমির দলিলে সই নেওয়া হয়েছে।

যৌথ মালিকানার জমির মালিকদের কাউকে কাউকে মৃত দেখিয়েও জমি কেনার ঘটনা পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে রাজৈরের বড়োখোলা গ্রামের প্রণব বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। তারা তিন ভাই। প্রণব বলেন, তার ছোটো ভাই পূর্ণেন্দু বিশ্বাস ১৯৮৮ সালে ভারতের চলে যান। সেখানেই কয়েক বছর আগে তার মৃত্যু হয়। তার (পূর্ণেন্দু) দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে, যারা ভারতে থাকেন। প্রণবের আরেক ভাই প্রশান্ত বিশ্বাস এক বছর আগে ভারতে গিয়ে আর ফেরেননি।

প্রণবের অভিযোগ, তাদের তিন ভাইয়ের ১৪২ শতাংশ জমি (প্রায় সাড়ে চার বিঘা) ফাঁদে ফেলে কিনে নেয় বেনজির আহমেদের পরিবার। এক্ষেত্রে তার দুই ভাইকে মৃত এবং ওয়ারিশহীন দেখানো হয়। বিক্রি দলিলে তার একার সই নেওয়া হয়। তিনি বলেন, এখন এলাকার লোকজন বলছে, আমি ভাইদের জমি আত্মসাৎ করেছি। কিন্তু কী পরিস্থিতিতে আমি এই কাজ করেছি, সেটা তো কেউ জানে না।

প্রণবের ভাষ্য, তার বসতবাড়ির জমির মালিকানাসংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ ছিল। সেই সুযোগ নিয়ে তার বসতবাড়ির জমির একটি ভুয়া দলিল করা হয়। তখন পুলিশ কর্মকর্তা তৈমুর ইসলাম তাকে বলেন, বেনজিরের রিসোর্টের কাছের জমি বিক্রি না করলে বসতবাড়ি থেকে তাকে উচ্ছেদ করা হবে।

পৈতৃক সম্পত্তি হস্তান্তর করতে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ওয়ারিশ সনদ দিতে হয়। সেই সনদ ছাড়া জমি বিক্রি করা যায় না। প্রণবের দাবি, তিনি কোনো কাগজপত্র জোগাড় করেননি। সবই করেছেন পুলিশ কর্মকর্তা তৈমুর।

প্রণবের নামে কোনো ওয়ারিশ সনদ

নেওয়া হয়েছিল কি না, জানতে চাওয়া হয়েছিল রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিধান বিশ্বাসের কাছে। তিনি দাবি করেন, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ভুয়া কোনো ওয়ারিশ সনদ দেওয়া হয়নি।

এদিকে বেনজির পরিবারের রিসোর্টের মধ্যে কৃষি খামারে কাজ করার সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ২০২০ সালের এপ্রিলে মারা যান গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী সুখদেব বল (বয়স ১৯)। তার ভাই সুব্রত বল বলেন, ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নিতে চেয়েছিলেন তার বাবা সুষেন বল। তবে কর্মকর্তা তৈমুরের হুমকিতে তারা মামলা করেননি। তৈমুর ঘটনা চেপে যেতে সুব্রতকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। যদিও চাকরি বা ক্ষতিপূরণ কোনোটাই পাননি তারা।

তৈমুরও দুর্নীতিবাজ

গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরে বেনজির পরিবারের জমি কেনার কাজ করা পুলিশ পরিদর্শক তৈমুর ইসলাম ১৯৯৫ সালে উপপরিদর্শক (এসআই) হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। পুলিশ সূত্র জানায়, রাজধানীর ধানমণ্ডি থানায় কর্মরত থাকাকালীন ২০০২ সালের জুনে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। পরে তিনি বিভাগীয় মামলায় জিতে ২০১০ সালের জানুয়ারিতে পুনরায় ঢাকা মহানগর পুলিশে (ডিএমপি) যোগ দেন। ২০১৩ সালের জুনে তিনি পরিদর্শক হন।

গোপালগঞ্জ জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বেনজিরের পক্ষে জমি কেনার কাজ করার সময় তৈমুর খুলনা মহানগর পুলিশে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে নিয়মিত গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরে গিয়ে বেনজিরের পক্ষে জমি কেনার কাজ করতেন। পরে ২০২১ সালে তাকে ফরিদপুরের ভাঙা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) দায়িত্ব দেওয়া হয়।

দুর্নীতির অভিযোগে ২০২১ সালের মার্চে তৈমুরের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছিল দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় তার বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়। দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনার সহকারী পরিচালক তরুণ কান্তি ঘোষ বলেন, মামলাটিতে এখনো অভিযোগপত্র দেওয়া হয়নি।

বেনজির আহমেদের পরিবারের পক্ষে জমি কেনার কাজ করার বিষয়ে বক্তব্য জানতে তৈমুর ইসলামের মুঠোফোনে কল করা হলে অপর প্রান্ত থেকে বলা হয়, তৈমুর ব্যস্ত আছেন। পরে কেউ আর ফোন ধরেননি। প্রশ্ন লিখে পাঠানো হলেও উত্তর পাওয়া যায়নি।

দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় তৈমুরের স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে খুলনা সদরের খান জাহান আলি সড়কের একটি বাড়ি। বাড়িটিতে গিয়েও তাকে বা তার পরিবারের কাউকে পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্র জানায়, বেনজির পরিবারের রিসোর্ট তৈরির প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে ছিলেন একজন নারী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

বেনজিরের পরিবারের রিসোর্টের আশপাশের জলাভূমিতে মাছ ধরতে যাওয়ায় মারধরের অভিযোগ হয়েছে পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় জেলে নিত্য বালা বলেন, ঘটনাটি এক বছর আগের। তিনি রাতে মাছকান্দি বিলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। একটু দূরেই বেনজিরের মাছের ঘের। বিলে মাছ ধরার সময় হঠাৎ চারটি নৌকায় পুলিশ সদস্যরা এসে তাকে-সহ তিনজনকে ধরে নিয়ে যায়। রিসোর্টে নিয়ে তাদের মারধর করে থানায় দেওয়া হয়।

নিত্য বালার ভাষ্য, ১০ হাজার টাকা দিয়ে তিনি মাছ চুরির মিথ্যা মামলা থেকে রক্ষা পান। তবে নৌকা-সহ মাছ ধরার সরঞ্জামাদি ফেরত পাননি।

গাজীপুরে

সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজির আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে গাজীপুরের কালীগঞ্জেও এভাবে বিপুল পরিমাণ জমি কেনা হয়েছে। এসব জমির বেশিরভাগই তিনি কিনেছিলেন হিন্দু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজনের কাছ থেকে। ভয় দেখিয়ে কিংবা প্রভাব খাটিয়ে তাদের কম মূল্যে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়। গাজীপুরের কালীগঞ্জের স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, এই উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের বেতুয়াটেক গ্রামে বেনজির ও তার স্ত্রীসন্তানদের নামে-বেনামে অনেক জমি রয়েছে। ভয় দেখিয়ে জলের দামে এসব জমি কিনে নেন বেনজির।

গাজীপুর জেলা প্রশাসনের একটি সূত্র বলছে, কালীগঞ্জ উপজেলায় বেনজির ও তার পরিবারের প্রায় ১৮১ বিঘা জমি রয়েছে। তবে দুর্নীতি দমন কমিশন বলছে, তারা এখানে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ বিঘা জমির সন্ধান পেয়েছে। আরও জমির খোঁজে অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে।

গাজীপুরে বেনজির পরিবার জমি কেনা শুরু করে ২০১৭ সাল থেকে। তখন র‍্যাবের মহাপরিচালক ছিলেন তিনি। এসব জমির দলিল বিশ্লেষণ করে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তারা বলছেন, গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরের মতো গাজীপুরেও তিনি হিন্দু খ্রিস্টানদের জমি কেনেন। বেনজির আহমেদ বেশিরভাগ জমি কেনেন আইজিপি (২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর) ও র‍্যাবের মহাপরিচালক থাকার সময়ে। তিনি র‍্যাবের মহাপরিচালক ছিলেন ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত।

দুর্নীতি দমন কমিশন কালীগঞ্জ সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে খোঁজ করে বেনজির ও তার স্ত্রী-কন্যার নামে কেনা ২০১ শতাংশ জমির ছয়টি দলিল পেয়েছে। এসব দলিল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই জমির মধ্যে হিন্দুদের জমি ছিল ১৩১ শতাংশ এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জমি ছিল ৭৭ শতাংশ। স্থানীয় লোকজন বলেছেন, বেনজির আহমেদ র‍্যাবের মহাপরিচালক থাকার সময় ভয় দেখিয়ে কালীগঞ্জের হিন্দু ও খ্রিস্টান

সম্প্রদায়ের জমি কিনে নেন। কালীগঞ্জের সাব-রেজিস্ট্রার জাহিদুর রহমান বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা বেনজির ও তার পরিবারের নামে ছয়টি জমির দলিল পেয়েছি।

বেনজির পরিবার এসব জমি যাদের কাছ থেকে কেনে, তারা হলেন সুধীর দাসের ছেলে সুদেব দাস; নরেশ মল্লিকের ছেলে কাশীনাথ মল্লিক, পরেশ মল্লিক ও আশুতোষ মল্লিক; সিলভেস্টার রোজারিওর ছেলে প্রদীপ রোজারিও, তার মেয়ে তারামণি; লোপেজ টছকানুর ছেলে হেনরি টছকানু, রিচার্ড টছকানু, রায়মন রোনাল্ড টছকানু ও দুই মেয়ে মিসেস রেবেকা কুইয়া ও রিনা টছকানু; হরেন্দ্র চন্দ্র গোপের ছেলে আশুতোষ ঘোষ ও সুশীল ঘোষ।

বেনজির যাদের কাছ থেকে জমি কিনেছেন, তাদের একজন সুশীল মণ্ডল। তার বাড়ি পুইন্নারটেক গ্রামে। ঢাকার তাঁতিবাজারে সোনার ব্যবসা রয়েছে তার। ওই এলাকায় তিনিই প্রথম বেনজির আহমেদের কাছে জমি বিক্রি করেন। তিনি বলেন, করোনাকালের আগের কথা। তিনি ৯ বিঘা জমি বেনজির পরিবারের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হন। তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

বেনজিরের জমি কেনা প্রসঙ্গে নাগরী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের সভাপতি ফিলিপ গমেজ বলেন, বেনজির তাদের এলাকায় প্রচুর জমি কিনেছেন। ভয় দেখিয়ে নামমাত্র দাম দিয়ে জমি লিখে নিয়েছেন। এ নিয়ে কথা বলার মতো সাহস কারও ছিল না।

‘বেনজির সংখ্যালঘুদের জমি কীভাবে দখল করেছেন, দেখে যান’

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজির আহমেদের বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জের হিন্দুদের ‘শত শত বিঘা’ জমি দখলের অভিযোগ এনে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ওই এলাকা ঘুরে দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কৃষির ওপর নির্ভরশীল ওই এলাকার মানুষদের জমি দখল করে ফেলায় তাদের দৈনন্দিন জীবনে বিশাল অর্থনৈতিক সংকট নেমে এসেছে।

গত ৭ জুন সন্ধ্যায় বেনজির আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন গোপালগঞ্জের সাভানা ইকো রিসোর্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল পার্ক এলাকা পরিদর্শন ও ভুক্তভোগী সংখ্যালঘু লোকজনের সঙ্গে কথা বলার পর সাংবাদিকদের কাছে এ মন্তব্য করেন রানা দাশগুপ্ত।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এই নেতা বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী এলাকাটি আপনারই। আপনি একবার এলাকায় আসুন, আপনি দেখে যান, কীভাবে এখানকার সংখ্যালঘুদের জায়গা-জমি জবরদখল করেছেন বেনজির আহমেদ। আমরা দাবি ও আবেদন জানাই, যাদের সম্পত্তিগুলো দখল করা হয়েছে, তাদের সম্পত্তিগুলো ফেরত দেওয়া হোক।’

এলাকাটি শতভাগ হিন্দুপ্রধান মন্তব্য করে রানা দাশগুপ্ত বলেন, তাদের শত শত বিঘা জমি জোর করে, হুমকি দিয়ে, নানাভাবে চক্রান্ত করে বেনজির দখল করে নিয়েছেন। শুধু দখলই করেননি, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে এমনভাবে চারদিকে বেষ্টনী করেছেন, যাতে অন্য কেউ ওই জায়গায় প্রবেশ করতে না পারে।

র‌্যাবের মহাপরিচালক ও পুলিশের মহাপরিদর্শক হিসেবে বেনজির আহমেদ যে ভূমিকা পালন করছেন, তা শুধু সরকারের ভাবমূর্তিই ক্ষুণ্ণ করেনি, গোটা দেশের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ করেছে বলে মন্তব্য করেন রানা দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, ‘আমাদের মনে হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞাগুলো এদের (বেনজির ও জেনারেল আজিজ) কারণেই হয়েছে। হয়তো নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার সময় আমরা এই বিষয়গুলো জানতাম না বলেই অনেক সময় মনে করেছি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।’

আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যের সমালোচনা করে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এই নেতা বলেন, ‘ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বেনজির ও আজিজ (সাবেক সেনা প্রধান) যা করেছেন, সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এখানে দেশের কোনো বিষয় নয়। এই বিষয়গুলোকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে চেপে রাখার কোনো বাস্তবতা নেই। আজকে তাদেরও বলা উচিত, এই মামলা চলমান থাকা অবস্থায় কী করে তারা (বেনজির-আজিজ) এ দেশ থেকে চলে গেলেন?’

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মণীন্দ্র কুমার নাথ ও তাপস কুমার পাল উপস্থিত ছিলেন।

‘সেটা অন্যায় ও অপরাধ’

বেনজির আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরপর তার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অনুসন্ধানে কমিটি করে সুপ্রিম দুর্নীতি দমন কমিশন। সংস্থাটি এখন পর্যন্ত বেনজির পরিবারের ৫২১ বিঘা জমি, ১৯টি কোম্পানির শেয়ার, গুলশানে ৪টি ফ্ল্যাট, ৩০ লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র, ৩৩টি ব্যাংক বিসাব এবং তিনটি বিও হিসাব (শেয়ার ব্যবসার বেনিফিশিয়ারি ওনার্স অ্যাকাউন্ট) খুঁজে পেয়েছে। আদালতের আদেশে এসব সম্পদ জব্দ ও অবরুদ্ধ করা হয়েছে। □

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

আইআইটির কৃতী ছাত্র বর্তমানে একজন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্রতী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সুন্দর পিচাইকে আজ সবাই চেনেন। ঠিক যেমন চেনেন জিতেন্দ্র কুমারকে, বিখ্যাত ওয়েব সিরিজ 'পঞ্চায়েত'-এর কল্যাণে। কিন্তু ক'জন জানেন বিপিন ধানের নাম? ক'জনই-বা চেনেন তাঁকে? এরা তিনজনই আইআইটি খড়্গপুরের কৃতী ছাত্র। প্রথম দু'জন কৃতী সেটা অনেকেই জানেন। কিন্তু এই বিপিন ধানে কে?

২০১৩ সালে আইআইটি স্নাতক হয়ে বেরোনোর পর যখন মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার নিপাট মধ্যবিত্ত ধানে পরিবার বিপিনকে জোর করে বিদেশে চাকরি করতে পাঠিয়ে দেয়, তখনও তাঁকে চিনত না কেউই। সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত বহুজাতিক সংস্থায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করার ইচ্ছে কিন্তু ছিল না বিপিনের। আইআইটিতে পড়াকালীন বন্ধুদের সে প্রায়ই বলত যে পাশ করে এই সমাজের জন্য, দেশের মানুষের জন্য সে কিছু করতে চায়।

চাকরিটা সত্যিই বেশি দিন করেননি বিপিন। বাড়িতে না জানিয়েই ছেড়ে দিলেন চাকরিটা। আরও মাসকয়েক সিঙ্গাপুরে থেকে টুকটাক ফ্রিলান্সিং করলেন ঠিকই। কিন্তু মন পড়ে থাকে দেশে। ছোটবেলার বান্ধবীকে ফোন করে বসলেন একদিন। দেশে ফিরে কোনো কাজ পাওয়া যাবে কিনা জানতে। সেই বান্ধবী তখন অসমের মাজুলিতে একটি স্কুলে চাকুরিরতা। তিনি জানান, ওই স্কুলে শিক্ষকের খুব প্রয়োজন। কিন্তু আইআইটি গ্র্যাজুয়েট বিপিন কি আর সেই কাজে আসবে? সানন্দে রাজি হয় বিপিন। মাজুলির সেই স্কুলে অঙ্ক ও বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে নতুন জীবন শুরু হয় তাঁর।

কয়েকমাস পর ওই স্কুলেরই কয়েকজন শিক্ষক বিপিনকে নিয়ে যায় কুলামু গ্রামে। মাজুলি উপকেন্দ্র থেকে অনেকটা ভিতরে এক প্রান্তিক জনজাতি গ্রাম। বছর পঁচিশের যুবক বিপিন যেন টাইম মেশিনে ১০০ বছর পিছিয়ে যান নিমেষে। ধারেকাছে কোথাও নেই একটা প্রাইমারি স্কুল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র! হাসপাতাল বা হাইস্কুল তো স্বপ্ন! গ্রামের মানুষেরা বিপিনদের সামনে পেয়ে তাদের ঘিরে ধরে। দাবি, তাদের গ্রামেও স্কুল চাই একটা। তাদের ছেলে-মেয়েরাও পড়বে, লিখবে। অসহায় বিপিন এবার আত্মসমর্পণ করে। কারণ স্কুল করতে তো অর্থের প্রয়োজন। তার কাছে তো সেটাই নেই। নাছোড় গ্রামবাসী। বলে ওঠে— আমরাই সব ব্যবস্থা করে দেব। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ৭০ জন ছেলে-মেয়ে নিয়ে চালু হওয়া স্কুলে বর্তমানে সংখ্যাটা ৩০০ জনের মতো। প্রায় ৮০ জন থাকে বিপিন ও গ্রামবাসীদের বানিয়ে দেওয়া অস্থায়ী হোস্টেলে।

চমকের আরও কিছুটা এখনও বাকি। কোনো বোর্ডের ধরাবাঁধা পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পড়ানো হয় না হামিংবার্ড স্কুলে। পাঠ্যক্রমের কিছুটা নেওয়া হয়েছে অসম বোর্ডের সিলেবাস থেকে। সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে হোমি ভাবার আদর্শ শিক্ষাপ্রণালী। আর রাখা হয়েছে জনজাতি জীবনের শিকড়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শিক্ষাক্রম। সেখানে যেমন বাঁশের কাজ, কৃষিকাজ, কুটিরশিল্পের পাঠ আছে, তেমনই আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং তা থেকে বাঁচার উপায়। একদিকে যেমন রয়েছে কম্পিউটার শিক্ষা, অন্যদিকে আছে আধুনিক সেলাই মেশিনে প্রাচীন জনজাতি সূচীশিল্প ফুটিয়ে তোলার পাঠ। আছে অবলুপ্তপ্রায় জনজাতি ভাষার শিক্ষা। চলছে সেই ভাষার লিপি তৈরির কাজ। মাসিক আড়াইশো টাকা টিউশন ফি ধার্য করেছে গ্রামবাসীরাই। যারা দিতে পারে না, তাদের জন্য স্পন্সর জোগাড় করেন বিপিনরাই।

ক্রমাগত বাড়ছে ছাত্রসংখ্যা। প্রান্তিক গ্রামগুলো থেকে বহু মানুষ প্রায়ই এসে দাবি জানায়, তাদেরও অমন স্কুল চাই। একা বিপিন গুটিকয়েক সঙ্গী নিয়ে পারবে কীভাবে? অতএব তাঁরা তৈরি করেছেন 'অয়ং ট্রাস্ট' ও 'অয়ং ফাউন্ডেশন'। স্থানীয় ভাষায় 'অয়ং' মানে ভালোবাসা। বিপিন আর তাঁর সঙ্গীরা এখন সপ্তাহান্তে ঘুরে ঘুরে করে চলেছেন স্নেহ ও ভালোবাসার বিস্তার। এখন মোট ৫০টা সরকারি ও আধা-সরকারি স্কুলে কাজ চালাচ্ছে অয়ং ফাউন্ডেশন। কেবল ৩২ বছর বয়স। স্বপ্ন কী জানতে চাইলে শুধু বলেন— 'আরও আরও প্রান্তিক জীবনে ছড়িয়ে যেতে হবে। পুঁথিগত শিক্ষা নয় শুধু, ব্যবহারিক ও নিজস্ব আদি সংস্কৃতির শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে প্রান্তিক ছেলে-মেয়েদের। চাই প্রচুর শিক্ষক, প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক। যারা আলো হাতে নির্দ্বিধায় এসে দাঁড়াতে পারবে অন্ধকার জনপদগুলোতে'।

ভারতের প্রান্তিক অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে সমর্পিত ব্যতিক্রমী শিক্ষাব্রতী বিপিন ধানের জীবন ও এই প্রয়াস সত্যিই রূপকথার গল্পের মতো!

মিঠুর স্বপ্ন

তখন সবে ভাদ্রমাস শেষ হয়ে আশ্বিন শুরু হয়েছে। মিঠুও খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়ল। দেখল, মা আর মাসি সাজি নিয়ে তৈরি হয়েছে বাগানে ফুল তুলতে যাবে বলে। মিঠু বলে উঠল দাঁড়াও মাসি, আমিও যাব। তাড়াতাড়ি চোখে-মুখে জল দিয়ে মিঠুও চলল ওদের সঙ্গে বাগানে।

কী মিষ্টি হাওয়া বইছে। আকাশে তেমন মেঘ নেই। যা আছে তা ঠিক পেঁজা তুলোর মতো দেখতে। গাছপালা সব সবুজ পাতায় ভরা। বাড়ির কাছেই বাগান। বাগানের চারিদিক বাঁশের কঞ্চির বেড়া দেওয়া আছে। সেখানে কত ফুলের গাছ। সেই ফুলে রং আর গন্ধে মিঠুর মন ভরে গেল। জবা, টগর, জুঁই, চাঁপা, চামেলি, স্থলপদ্ম – আরও কত ফুল। ফুলে ফুলে মা আর মাসির সাজি উপচে পড়ছে।

ওসব দেখতে দেখতে মিঠু আনমনা হয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ একটা কিছুতে হোঁচট খেয়ে টাল সামলাতে একটা সরু গাছের গুঁড়ি দুহাতে জড়িয়ে ধরল। তারফলে গাছটি সামান্য নড়ে ওঠায় মিঠুর মাথায় একরাশ শিউলি ঝরে পড়ল। এবার মিঠু জানতে পারল তার মামার বাগানে শিউলিফুলের গাছও আছে।

মিঠু তাড়াতাড়ি একটা ঝুড়িতে শিউলিফুল কুড়িয়ে রাখতে লাগল। ফুল কুড়োতে কুড়োতেই সে দেখল, দূরে একটা জায়গা সাদা হয়ে আছে। আর তার ওপারেই দেখা যাচ্ছে ঘন জঙ্গল। জায়গাটা কী সুন্দর দেখাচ্ছে। মিঠু ভাবল, কাউকে না বলে আজই জায়গাটা দেখতে হবে।

বেলা ১০টা বাজতেই মিঠু স্নান সেরে, জলখাবার খেয়ে, সুযোগ বুঝে রওনা দিল ওই সুন্দর জায়গাটা দেখবার জন্য। একটু কাছে যেতেই বুঝতে পারল কাশফুল ফুটে জায়গাটা সাদা হয়ে রয়েছে। মিঠু কাশফুলের দেশে প্রবেশ করল। ফুলগুলিকে জড়িয়ে ধরতে লাগল। তখনই মিঠুর মনে হলো, আর কদিন পরেই তো মা দুর্গা তাঁর চার ছেলে-মেয়েকে নিয়ে এই পৃথিবীতে আসতে চলেছেন। তখন পূজার আনন্দে মাতবে সবাই।

আনন্দে মিঠু কাশবনের মধ্যে দৌড়তে শুরু করল। একসময় পাশের ওই ঘন জঙ্গলের দিকে ছুটতে লাগল। ওখানে কত গাছ। সবুজে ভরা। মিঠু ছুটছে। হঠাৎ কেউ একজন চিৎকার করে বলে উঠল— দাঁড়াও! মিঠু থমকে দাঁড়াল। চোখ খুলে দেখল, কোথায় কাশবন আর কোথায় ঘন জঙ্গল! সে তো কলকাতায় নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে রয়েছে। তবে কী সে এসব স্বপ্ন দেখছিল? মিঠু বিছানায় উঠে বসল, তারপর পাশের জানালাটা খুলে দিল। বাইরেটা মন দিয়ে দেখল। এই জায়গাটাই তো দুবছর আগে সবুজ গাছে ভরা ছিল। ওই তো ওধারে শরৎকাল এলেই কাশফুলে ভরে উঠত। ঠিক ওই স্বপ্নের মাঠটির মতো, ঘন জঙ্গলটির মতো। মিঠুর চোখের কোণে জল এল। এখন সেই জায়গাটায় আর মাঠ নেই। জঙ্গল নেই। সব সবুজ ধ্বংস করে এখন তৈরি হয়েছে একটা কারখানা এবং সারি সারি বহুতল আবাসন। মিঠু শপথ নিল, বড়ো হয়ে এই অনাচারের বিরুদ্ধে লড়বে, সবুজ রক্ষা করবে।

মিঠুর বয়স এখন মাত্র ছ'বছর। এর মধ্যেই সে বুঝতে শিখেছে, আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো অরণ্য। বাবার মুখে শুনেছে, অরণ্য আমাদের প্রাণবায়ু দেয়। ছোট্টো বন্ধুরা, আমাদেরও সেটা বোঝা দরকার। চলো, আমরা মিঠুকে সাহায্য করি। আমাদের বাড়িতে যতটুকু জায়গা আছে, সেখানেই যেন আমরা গাছ লাগাই। প্রতিজ্ঞা করি, গাছ আমরা কাটবো না, কাউকে কাটতে দেবো না। চলো, আমরা সবাই একটা করে গাছ লাগাই আর তার পরিচর্যা করি। সবাই মিলে বলি– গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও।

রূপসা রায়, নবম শ্রেণী

নদ-নদী পরিচয়

দ্বারকেশ্বর নদ

দ্বারকেশ্বর নদ পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর থানা আদ্রা ও হুড়ার মাঝে মাধবপুরের কাছে একটি ঝিল থেকে উৎপন্ন হয়ে ছাতনার কাছে বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর জেলা সদর বাঁকুড়া শহরে পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে প্রবেশ করেছে। তারপর হুগলী জেলার মধ্যে দিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের কাছে শিলাই নদী সঙ্গে মিলিত হয়ে রূপনারায়ণ নাম নিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ঝিল থেকে উৎপন্ন হয়ে কিছুদূর এসে রোক ও দুধভরিয়া নামে দুটি নদের সঙ্গে মিলেছে। আবার ছাতনার কাছে কুমাসি নদীও দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে মিশেছে। আবার বাঁকুড়া শহরের কাছে গন্ধেশ্বরী নদীও মিশেছে। দ্বারকেশ্বর নদ বর্তমানে জলহীন। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও আরামবাগ শহর তিনটি এই নদের তীরে অবস্থিত।

এসো সংস্কৃত শিখি– ২৬

পুস্তকম–বইটি। পুস্তকস্য–বইটির।
পুস্তকস্য নাম কিম্ ? পুস্তকস্য নাম রামায়ণম্।
পুস্তকস্য নাম কিম্ ? পুস্তকস্য নাম গীতা।

অভ্যাস করি–১

ফলম–ফলস্য, পুষ্পম্–পুষ্পস্য, গৃহম–গৃহস্য, ভবনম্–ভবনস্য, নগরম্–নগস্য, রাজ্যম্–রাজ্যস্য।

অভ্যাস করি--২

ফলস্য নাম কিম্ ? –ফলস্য নাম নারিকেল।
পুষ্পস্য নাম কিম্ ?–পুষ্পস্য নাম করবী।
ভবনস্য নাম কিম্ ?–ভবনস্য নাম কলাভবনম্।

প্রয়োগ করি

লোকয়ানম্, পরীক্ষাকেন্দ্রম্, রেলযানম্, মন্দিরম্,

বিঃ দ্রঃ - ক্লীবলিঙ্গের রূপটি পুংলিঙ্গের মতোই স্য/স্য হবে।

ভালো কথা

আমার রসিক ছোটোদাদু

আমার তখন জন্ম হয়নি। আমাদের বাড়িতে তখন ১৬টি গোরু ছিল। প্রচুর দুধ হতো। সেই দুধ শ্যামচক স্কুলবাজারে এক মিষ্টির দোকানে দেওয়া হতো। কোনো কোনো দিন ছোটোদাদু স্কুল যাওয়ার পথে দুধ দোকানে দিয়ে যেতেন। একদিন দাদু বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে একটা বোতলে কিছুটা দুধে বেশ জল মিশিয়ে দোকানদারকে দিলেন। দোকানদার বললেন, আজ তোমাদের দুধে জল মেশানো কেন? ছোটোদাদু বললেন, আজ আমার বউদি গোরুগুলিকে বেশি করে পুকুরের জল খাইয়েছে, তাই দুধটা একটু জল জল হয়েছে। কাল বউদিকে কম করে জল খাওয়াতে বলবো। এই কথা শুনে দোকানদার-সহ সবাই হাসতে লাগল। ছোটোদাদু সঙ্ঘের প্রচারক। এখন অখিল ভারতীয় দায়িত্ব আছে। গল্পটি আমার দাদুর কাছে শোনা।

শ্রেষ্ঠা দত্ত, অষ্টমশ্রেণী, অভিরামপুর, পঃ মেদিনীপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ছিঃ ছিঃ

সায়ন চক্রবর্তী, একাদশ শ্রেণী, শিলচর, অসম।

গরমেতে দর্পচূর্ণ
অহংকার তবু পরিপূর্ণ
ঘরে ঘরে বাড়ছে এসি,
'লাগাও গাছ বাঁচাও প্রাণ'
শুধু পরিবেশ রক্ষার ভান
ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

জ্যৈষ্ঠমাসে বনমহোৎসব
শুধু দেখানোর উৎসব
কাজের কাজ কিছু হয় না,
ঘটা করে লাগানো গাছ
মরে গিয়ে হয় সাফ
তার খোঁজ কেউ রাখে না।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি—বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

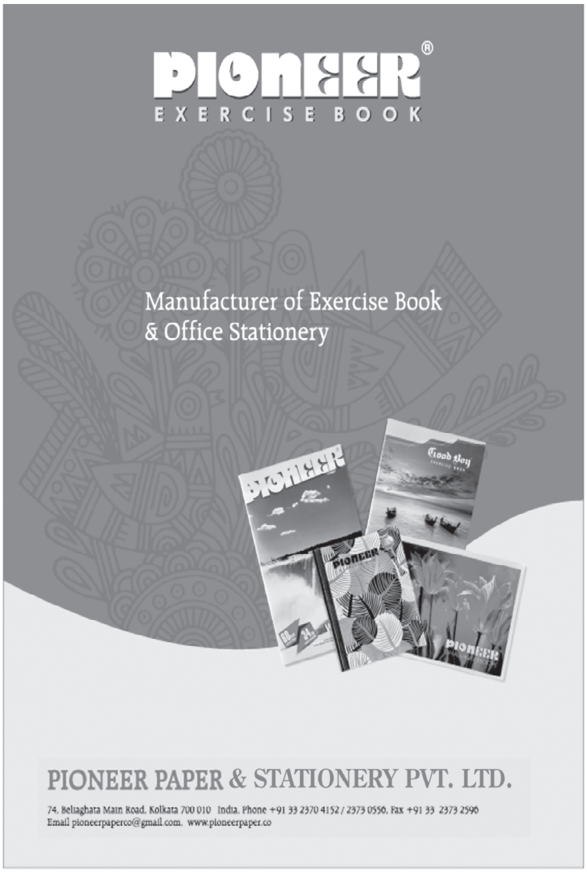

With Best Compliments from -

A

Well wisher

চীন দেশে চু-চেন্-তাং-এর শুভ জন্মদিন পালন

মণীন্দ্রনাথ সাহা

একপা দু'পা করে এগিয়ে এসেছিল ১৬৩টি জন্মদিন। ২০২৪-এর ৭ মে রবিঠাকুরের সেই ১৬৩তম জন্মদিন পালন হয়েছিল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এবং তার সঙ্গে পালন হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বদেশ প্রেমের কবি। তিনি মনে করতেন এই দেশ মৃণ্ময়ী নয়, চিন্ময়ী। দেশের মানুষ ভালো হলেই দেশ ভালো হবে। দেশনেতাদের প্রতি তাঁর সতর্কবাণী ছিল, দেশকে ভালো না বাসলে, ভালো করতে চাইলেও ভালো করা যায় না। দেশ বিভাগের কষ্ট তিনি ভোগ করেননি কিন্তু বঙ্গভঙ্গের কষ্ট তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদীরূপে তিনি ছিলেন সবার আগে। রাখিবন্ধন থেকে শুরু করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে দেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলতে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি বাড়ানোর জন্য তিনি সাতাশটি দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁর স্বদেশ প্রেমের একাগ্রতা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি ছিলেন ভারতের জাতীয় কবি। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীরা তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে, তাঁর গান গেয়ে নিজেদের বিপ্লবী চেতনাকে জাগ্রত রাখতেন। তিনি ভারতাত্মার জয়গান গেয়েই তো বিশ্বকবি হয়েছেন। দেশের মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন জন্যই তো মানবতাবাদী হয়েছেন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের প্রত্যাশী ছিলেন। শুধু ভারতবাসীর নন, তিনি বিশ্ববাসীর মন-প্রাণ জুড়ে রয়েছেন। তার নজির রয়েছে তাঁর প্রতি চীনদেশের জনগণের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্যে। সেটাই একটু দেখে নেওয়া যাক।

১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' লিখে কবি তখন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে ভারতরবির খ্যাতি। তাই দেশ দেশান্তর থেকে প্রচুর আমন্ত্রণ আসছে কবিগুরুর কাছে। কেউ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পদধূলি দিয়ে দেশের জ্ঞানী-গুণী ও ছাত্রদের উদ্দেশে কিছু বলতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি যে বিশ্বকবি, বিশ্বের ডাকে সাড়া না দিয়ে তিনি তাদের বিমুখ করবেন কী করে! তাই পূর্ব এশিয়ার জাপান থেকে শুরু করে ব্রিটেন, সুইডেন, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, জার্মান প্রভৃতি আরও কত দেশ তিনি ঘুরলেন, তার ইয়ত্তা নেই। তারপর ডাক এলো চীন থেকে। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আমন্ত্রণ জানালো। সে সময় ভারতের বন্ধু, কৃষ্টি ও সভ্যতার সহযাত্রী চীনের আমন্ত্রণ পেয়ে কবি খুব খুশি হয়েছিলেন। গ্রহণ করলেন তাঁদের আমন্ত্রণ।

ওদিকে চীনে তখন মহা হুলুস্থুল পড়ে গেছে। ভারতঋষি বিশ্বকবি আসছেন চীন ভ্রমণে। কীভাবে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হবে। তাই নিয়ে সবাই মহাব্যস্ত। কীভাবে বিশ্বকবিকে করা হবে স্বাগত, আদর, আপ্যায়ন। তাই নিয়ে দেশের ছোটো-বড়ো, যুবক, ছাত্র সবার পক্ষ থেকে চীন সরকারের কাছে প্রস্তাব গেল, মহামান্য অতিথি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যেন চীন সম্রাটের রাজপ্রাসাদেই রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এই উত্তম প্রস্তাব সম্রাটও সৌভাগ্য মনে করে গ্রহণ করলেন সাদরে।

আজ থেকে ১০০ বছর আগে অর্থাৎ ১৯২৪ সালে কবি পদার্পণ করেছিলেন ঐতিহাসিক পিকিং শহরে। সমস্ত চীন দেশের লোক ভেঙে পড়েছিল কবিকে দেখে ধন্য হতে। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সকলেই অবাক। কই, কবি কোথায়! সবাই বিস্মিত। এ যে শান্ত সমাহিত ভারতীয় ঋষি। চোখে-মুখে অপূর্ব সুন্দর জ্যোতি। শ্রদ্ধায় অবনত হলো সকলের মস্তক। চীন সম্রাট হু-য়ান-তাং বিশ্বকবিকে অভ্যর্থনা জানালেন। দেশবাসীর পক্ষ থেকে তিনি তাঁকে উপহার দেওয়া হলো চারশো বছরের পুরনো একখানি ছবি, ভারত-চীনের অতীত দিনের মধুর সম্পর্ককে স্মরণ করে। এই উপহারে বিশ্বকবি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন।

কবি যখন চীনে অবস্থান করছিলেন, সেই সময়ই এসে গেল তাঁর জন্মদিন। স্বাভাবিকভাবেই চীন দেশে কবির আগমনের আনন্দের ঢেউ যেতে না যেতেই আরেক আনন্দের বান এলো, এলো পঁচিশে বৈশাখ। আনন্দে মেতে উঠল চীনবাসী। বিশ্বকবির জন্মোৎসব পালন করবে তারা কবিকে সঙ্গে নিয়ে।

কবি ভাবলেন, 'পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই, তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই...।' পরমাত্মীয়ের খোঁজ পেলেন কবি এখানেও। চীন দেশীয় রীতিতেই পালন করা হলো কবিগুরুর জন্মদিন। সারাদেশ থেকে এল শতশত উপহার। নীল পায়জামা, কমলারঙের আলখাল্লা, আর মাথায় বেগুনি রঙের টুপি দিয়ে সাজানো হলো কবিগুরুকে। সবার সামনে দাঁড়িয়ে কবি বক্তৃতা করলেন আবেগ ভরা কণ্ঠে।

চীনের মানুষও তাদের প্রাণের ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করল বরেণ্য কবির জন্মোৎসবে। তারা শুধু শ্রদ্ধা জানিয়েও ক্ষান্ত হলো না, তাদের নিজস্ব ভাষায় কবির নতুন নামকরণ করে কবিকে করে নিল তারা একান্ত আপনার, পরমাত্মীয়। সে নাম 'চু-চেন্-তাং' যার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায়— 'বজ্রের মতো পরাক্রান্ত ভারতসূর্য।' □

ফ ঃ ৬

ভারতবর্ষ—গ্রিক আক্রমণের পরে

অমলেশ মিশ্র

আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে ভারতীয় পরাক্রমী যোদ্ধা ও দেশগুলির কথা ভারতীয় ছাত্ররা জানে না। তাদের পাঠক্রমে কিছুই নাই। তারা শুধু আলেকজান্ডারের জয়ের ইতিহাসটাই পড়ে— শিরোনাম— Alexander the Great।

ভারতীয়দের হীনমন্য করে রাখলেনই ইংরেজদের লাভ এবং ইংরেজপ্রেমী ইন্ডিয়ান ভারতীয়দেরও। হীনম্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত দাসমনোবৃত্তি— অপরের গোলামি, আত্মমর্যাদাবোধ হীনতা ও দেশ বিরোধিতা।

আলেকজান্ডারের মৃত্যুর (খ্রি.পূ. ৩২৫) ছ' মাসের মধ্যেই ভারতের মানুষের মন থেকে তিনি অপসৃত হন। ভারতে তাঁর প্রতিনিধিরা তিন বছরের মধ্যেই (৩২৫-৩২২ খ্রি.পূ.) ভারত থেকে উচ্ছেদ হয়ে যান। তাঁর সমস্ত চিহ্নই মুছে গেছিল। গ্রিক আক্রমণের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দেশপ্রেমী ভারতীয়রা যে প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন তার নেতৃত্ব ছিল চাণক্যের হাতে এবং সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন পুরোভাগে।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালের (খ্রি.পূ. ৩২৬) আগে থেকেই চাণক্য তক্ষশীলায় থাকতেন। ভারতীয় ভূভাগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রাজ্য শাসন, ভূপ্রকৃতি বিষয়ে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। সীমান্তের ওপারেই পারস্য দেশ। ওই দেশ যদি ভারত আক্রমণ করে তাহলে ভারতের ছোটো ছোটো রাজ্যগুলি, যতই পরাক্রমী হোক, সে আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে না। পারস্য সম্রাট গ্রিক আক্রমণ করে জয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু ছোটো ছোটো গ্রিক রাজ্যগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে পারস্যকে প্রতিহত করতে পেরেছিল। চাণক্য বুঝেছিলেন যে সম্পদশালী ভারতে বিদেশি আক্রমণ সম্ভব এবং সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রী রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী দেশ গঠন করতে হবে। উত্তর ভারতে তখন শক্তিশালী দেশ ছিল মগধ। আচার্য চাণক্য মগধে এলেন। ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুটির সবই পরিভ্রমণ করলেন। মগধ রাজসভায় তিনি দানাধ্যক্ষের পদ পেলেন। এই পদে কাজ করতে হলে ধর্মশাস্ত্র ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান আত্যাবশ্যক।

খ্রি.পূ. ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতে কোনো ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না। ১৬টি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল— ষোড়শ মহাজন পদ। এগুলি হলো অঙ্গ (পূর্ব বিহার), মগধ (দ. বিহার), বৃজি (উত্তর বিহার), কাশী, কোশল (অযোধ্যা), মল্ল (গোরক্ষপুর), চেদি (বুন্দেলখণ্ড), বৎস (প্রয়াগ), কুরু (দিল্লি), পাঞ্চাল (বেরিলি-বদায়ুন), মৎস (জয়পুর), শূরসেন (মথুরা), অশ্বক (গোদাবরী উপত্যকা), অবন্তী (মালব), গান্ধার (পেশোয়ার-রাওলপিণ্ডি) এবং কম্বোজ (পশ্চিম কাশ্মীর)। এগুলির মধ্যে বৃজি (উ. বিহার) এবং মল্ল (গোরক্ষপুর) ছিল প্রজাতান্ত্রিক, বাকিগুলি (রাজতান্ত্রিক)।

> **শেক্সপিয়র বলেছিলেন— মানুষ মারা যায় কিন্তু যে দুষ্কর্মটি সে করে তা, তার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে। The evil man do, lives after them।**

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক সময়ে মগধের রাজা ছিলেন— হর্যঙ্ক বংশের বিম্বিসার ৪৫৫ (খ্রি.পূ.)। পরে পরে অজাতশত্রু, উদয়ীভদ্র, অনুরুদ্ধ, মুণ্ড ও নাগদশক। এরা সকলেই ছিলেন ওই হর্যঙ্কবংশের। রাজা নাগদশককে হত্যা করে শিশুনাগ মগধের সিংহাসনে বসেন। অজাতশত্রু বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী ছিলেন না। রাজশক্তি যদি সর্ব বিষয়ে অহিংসা পালন করে তাহলে দেশকে পররাজ্য গ্রাস করবে। শিশুনাগের পর পুত্র কালাশোক বা কাকবর্ণ— প্রতিষ্ঠিত হলো শিশুনাগ বংশ। কালাশোককে হত্যা করে মহাপদ্মনন্দ মগধের সিংহাসন দখল করলেন। তিনি সমগ্র উত্তর ভারতে মগধের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতে— এই মহাপদ্মনন্দই উত্তর ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট। পরে পরে আরও আটজন সম্রাট রাজত্ব করেন যাদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি ধনানন্দ— গ্রিক ও পারস্য সম্রাট আলেকজান্ডারের সমসাময়িক। আলেকজান্ডারের মগধ দখল করার বাসনা পূর্ণ হয়নি। তিনি তাঁর বাহিনীর ইচ্ছামতো ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

খ্রি.পূ. ৩১২ অথবা ৩২৪ থেকে খ্রি.পূ. ১৮৭ পর্যন্ত ভারতে মৌর্য সমাজের যুগ। এই বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় চাণক্যের নেতৃত্বে চন্দ্রগুপ্তর কৃতিত্বে। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে পরেই তাঁর সাম্রাজ্যের অবসান হয়েছিল কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পরেও বহুকাল মৌর্য সম্রাজ্য টিকেছিল। তবু আলেকজান্ডার গ্রেট, চন্দ্রগুপ্ত নন। এই একটি ঘটনাই প্রমাণ করে ভারতের ইতিহাস লেখকরা কোন মনোভাবের মানুষ। এই যুগের ইতিহাস উপাদানও বহুবিধি সূত্র থেকে পাওয়া যায়। যেমন— মেগাস্থিনিস, প্লিনি, জাস্টিন-এর রচনা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বিশাখাদত্তের মুদ্রারাক্ষস, সোমদেব ভট্টের কথা

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর (২৯৮ খ্রি.পূ.) তাঁর পুত্র বিন্দুসার অমিত্রঘাত' (শত্রু ধ্বংসকারী) উপাধি নিয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের অসমাপ্ত কাজের ভার পড়েছিল বিন্দুসারের উপর। সমস্ত ভারতকে একটি শক্তিশালী দেশরূপে নির্মাণ করতে হবে।

লক্ষণীয় যে, ভারতের দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে তখনও কোনো বিদেশি আক্রমণ হয়নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং রাজারা স্বাধীন। বিন্দুসার দক্ষিণ ভারত অভিযান জয় ১৭টি রাজ্যকে ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন। ভারত তখন বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী দেশ।

বিন্দুসারের মৃত্যুর (২৭৩ খ্রি.পূ.) পর তাঁর পুত্র অশোক বড়ো ভাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সম্রাট হলেন। বৌদ্ধমত গ্রহণ করার পর তিনি অহিংস হলেন এবং সাম্রাজ্যও অহিংস হয়ে গেল। বৌদ্ধরা বেদ বা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না— তাই ভারতে তারা তেমন বিস্তার লাভ করতে পারেনি এতকাল। কিন্তু এখন রাজশক্তিই বৌদ্ধদের হয়ে গেল। হিন্দুদের (প্রজা) কাছ থেকে 'কর' আদায় করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভরণ-পোষণ হতে থাকল। সম্রাট অশোক বললেন— শস্ত্র বিজয় অপেক্ষা ধর্ম বিষয় শ্রেয়তর। অথচ মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল শস্ত্র বলের মাধ্যমেই। অশোক ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের শিখরে বসে বললেন— 'ধর্ম হিংসা তথৈবচ' বললেন না। মূল আপ্তবাক্যটি হলো—

অহিংসা পরমোধর্ম
ধর্ম হিংসা তথৈবচ।।

ধর্মের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, আততায়ীর হাত থেকে

সরিৎসাগর, ক্ষেমেন্দ্রর বৃহৎ কথা মঞ্জুরী, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র, বিভিন্ন পুরাণ এবং অশোকের শিলালিপি।

আলেকজান্ডার তাঁর সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপতিদের অধীনে দিয়ে গেছিলেন। সিরিয়া ও ভারতবর্ষ ছিল সেকুকাসের নেতৃত্বে। তিনি ভারতের আলেকজান্ডার অধিকৃত দেশগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন যেহেতু সেই দেশগুলি নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিল। এই ক্ষেত্রেই চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে সেলুকাসের যুদ্ধ হয়। এবং সেলুকাস বাহিনী পরাজিত হয়। যে গ্রিক বাহিনী উন্নত মস্তকে ভারত জয় করতে চেয়েছিল, সেলুকাসের নেতৃত্বে সেই বাহিনী অবনত মস্তকে তরবারি কোষবদ্ধ করে হিন্দুকুশ পর্বতের ওপারে চলে যেতে বাধ্য হয়। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষ শুধু আধ্যাত্মিকতার দেশ নয়, বীর যোদ্ধাদেরও দেশ।

বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের লেখা মারাঠী ভাষায় একটি পুস্তক আছে, শিরোনাম— 'ভারতীয় ইতিহাসতীল সহা সোনেরী পানে।' বাংলা ভাষায় 'ভারতীয় ইতিহাসের ছয়টি স্বর্ণময় অধ্যায়।' চন্দ্রগুপ্তের এই গ্রিক (যবন) বিজয়ের কাহিনি— বিজয় গৌরবের প্রথম অধ্যায়।

ভারতে বিদেশি আক্রমণকারীদের পর্যুদস্তও পরাজিত করে অখণ্ড ভারত রচনায় আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র— পুষ্যমিত্রা সুঙ্গ, তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র এবং পৌত্র বসুমিত্র। সম্রাট

নিজেকে বাঁচানোর জন্য যে হিংসা— সে হিংসা নিষিদ্ধ নয়। তাই অস্ত্র পরিত্যাগ করে অহিংস হয়ে গেলে সাধুদের পরিত্রাণ করবে কে? দুষ্কৃতীকে বিনাশ করবে কে? আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করবে কে?

২৩২ খ্রি.পূর্বাব্দে অশোকের মৃত্যুর পর অহিংস ভারতকে আবার বিদেশি আক্রমণের মুখে পড়তে হলো।

চন্দ্রগুপ্ত যে সেলুকাসকে হিন্দুকুশ পর্বতের ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সেলুকাস বল্‌খ বা বহ্লিক বা ব্যাকট্রিয়ায় নিজের স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ইউরোপের মূল গ্রিস দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। মৌর্য রাজশক্তি দুর্বল হয়েছে বুঝতে পেরে ডিমিট্রিয়স হিন্দুকুশ পেরিয়ে এসে আবার ভারত আক্রমণ করলেন। বীর যোদ্ধাদের দেশ এখন অহিংস। ফলে ডিমিট্রিয়সের জয় ঠেকানো গেল না।

অশোকের মৃত্যুর পর দক্ষিণের কলিঙ্গ ও অন্ধ্র মৌর্য অহিংস শাসকদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করল। কলিঙ্গের স্বাধীন ও পরাক্রমী রাজা খারবেল মগধ অধিকার করে অযোধ্যার কাছাকাছি গ্রিক বাহিনীর (ডিমিট্রিয়স) সম্মুখীন হলেন। পর্যুদস্ত ডিমিস্ট্রিয়স পঞ্চনদীর ওপারে চলে এলেন। খারবেল বৈদিক রীতিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। নিষিদ্ধ হওয়া বৌদিক যাগ-যজ্ঞ আবার শুরু হলো। কলিঙ্গরাজ খারবেলের বিজয় উত্তর ভারতে অবৌদ্ধ হিন্দুদের উৎসাহিত করল। মগধ আক্রান্ত হতে পারে এমন আকাঙ্ক্ষা দেখা গেল।

মগধরাজ বৃহদ্রথ অহিংস ও দুর্বলচিত্ত। তাঁর বাহিনীতে একজন বীর ব্রাহ্মণ যোদ্ধা ছিলেন। নাম পুষ্যমিত্র। গ্রিক অভিযানের মুখোমুখি হওয়ার জন্য অহিংস বৃহদ্রথ অবৌদ্ধ পুষ্যমিত্রকে সৈনাপত্যে বরণ করলেন। প্রধান সেনাপতি পদে বৃত্ত হয়ে পুষ্যমিত্র মগধ বাহিনীর সংখ্যা ও গুণগত মান উন্নত করার কাজে হাত লাগালেন।

পুষ্যমিত্র সুঙ্গ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে নিজেই মগধের সিংহাসনে বসলেন। মহাপদ্মনন্দের শেষ উত্তরাধিকারী ধনানন্দকে হত্যা করে যে মৌর্য সাম্রাজ্যের শুরু হয়েছিল, বৃহদ্রথকে হত্যা করে সেই সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটল।

পুষ্যমিত্র রাজা হলেন খ্রি.পূ. ১৮৪ অব্দে। তাঁর প্রথম কাজ হলো বিদেশি শক্তি গ্রিকদের সমূলে উৎপাটন করা। গ্রিক মিনান্ডার ছিলেন অযোধ্যায়। পুষ্যমিত্রর আক্রমণে মিনান্ডার শুধু পরাজিত হলেন নয়, পুষ্যমিত্র তাকে তাড়া করে সিন্ধুনদের ওপার অব্দি পাঠিয়ে ছিলেন। গ্রিকদের শাসন থেকে ভারতের সব রাজ্যকে মুক্ত করা হলো। এরপরে আর গ্রিকরা ভারত আক্রমণ করেনি। আজ থেকে প্রায় ২৩০০ বছর আগেকার কথা। খ্রি.পূ. ৩২৬ অব্দ থেকে খ্রি.পূ. ১৮৪ অব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৫০ বছর ভারতে গ্রিকদের ও ব্যাকট্রিয়ান গ্রিকদের আধিপত্য ছিল।

পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ (হিন্দু ব্যবস্থা) করেছিলেন। হিন্দুরা তাদের পুরানো ধর্ম আচরণের অধিকার ফিরে পেল। এই অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগী, দার্শনিক, বিশিষ্ট পণ্ডিত ও নরপতিরা উপস্থিত ছিলেন। সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল মহর্ষি পতঞ্জলির।

বৌদ্ধরা নীতি ও আদর্শগত ভাবে অহিংস ছিলেন। ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতে ইসলাম আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ইসলামিরা বৌদ্ধদের ব্যাপক প্রাণনাশ করেন। তাদের নীতি ছিল— হয় ইসলাম গ্রহণ করো অথবা মৃত্যুবরণ কর। বৌদ্ধরা ইসলামিদের প্রতিহত করতে পারল না অহিংস নীতির কারণে। ইসলামিরা নালন্দা থেকে ব্যাপক বৌদ্ধ বিনাশ শুরু করে। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে অসংখ্য বৌদ্ধ থাকতেন। তারা ছিলেন ন্যাড়া অর্থাৎ মুণ্ডিত মস্তক। অইসলামিদের হত্যা করতে গিয়ে বিনা বাধায় বৌদ্ধ হত্যা চলেছিল। পরে বৌদ্ধরা বহু সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের চলতি ভাষায় বলা হতো নেড়ে মুসলমান— নেড়ে অর্থাৎ ন্যাড়া অর্থাৎ মুণ্ডিত মস্তক।

অহিংসা পরমোধর্ম— বৌদ্ধরা শুধু এটুকুই বলতেন। তাই তারা বাধা দিতে পারেননি ইসলামিদের। হিন্দুদের কাছে— অহিংসা পরমোধর্ম, ধর্ম হিংসা তথৈবচ। অর্থাৎ গায়ে পড়ে হিংসা করবে না। কিন্তু ধর্ম রক্ষায় হিংসাই পরমধর্ম।'

যুদ্ধ ও তজ্জনিত হিংসা ও হত্যা সম্রাট অশোক পছন্দ করতেন না। ফলে অশোকের কালে হিন্দু বীরত্ব— ধর্মের জন্য যুদ্ধ ইত্যাদি অনুমোদিত ছিল না। কিন্তু পররাজ্য গ্রাসের উদ্দেশ্যে হত্যা বন্ধ হয়নি। আধুনিককালে অহিংসা মন্ত্র শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্যই ফরমান দিয়েছিলেন গান্ধীজী। ফলে মুসলমান ও খ্রিস্টানরা লক্ষ লক্ষ হিন্দুহত্যা করলেও গান্ধীজী মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু হিন্দু বিপ্লবীরা খ্রিস্টান ইংরেজদের মারলে তিনি অতি সক্রিয় হয়ে যেতেন। সমগ্র নোয়াখালি হিন্দু শূন্য হয়ে গেল। মোপলা মুসলমানরা হিন্দুদের উপর অবলীলায় অত্যাচার করল— গান্ধীজী চুপ থাকলেন। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং বা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডেও তিনি নীরব ছিলেন। কিন্তু চৌরি চোরায় বা বিহারে যখন অত্যাচারিত হিন্দুরা বদলা নিতে গেল তিনি বিহারে দৌড়ালেন। চৌরিচোরায় হিন্দুদের আক্রমণে ইংরেজারা মারা যাওয়ায় তিনি তাঁর আন্দোলন বন্ধ করেছিলেন। অর্থাৎ অহিংসা কেবল ভারতীয় হিন্দুদের জন্যই।

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর দেখা গেল ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল হিন্দুদের জন্যই। ইসলাম বা খ্রিস্টানরা সাম্প্রদায়িকতা করলে দোষ নাই, কেবল হিন্দুরা হিন্দুদের কথা বললেই 'সাম্প্রদায়িক' ছাপ মেরে দেওয়া হয়। মুসলমান ও খ্রিস্টানরা যখন কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থের কথা বলে তখন তারা ধর্মনিরপেক্ষ আর হিন্দুরা যখন তাদের স্বার্থের কথা বলে তখন তা হয়ে যায় সাম্প্রদায়িকতা।

শেক্সপিয়র ঠিকই বলেছিলেন— মানুষ মারা যায় কিন্তু যে দুষ্কর্মটি সে করে তা, তার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে। The evil man do, lives after them। □

ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সের স্পিকারের হাতে তুলে দেওয়া হলো শ্রীমদভগবদগীতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ২৪ মে তারিখে ব্রিটিশ সংসদ (ইউনাইটেড কিংডম পার্লামেন্ট)-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ব্রিটিশ সংসদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সে দান করা হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী সংবলিত গ্রন্থ শ্রীমদভগবদগীতা। ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক এই গ্রন্থ মানবজাতির একটি সম্পূর্ণ জীবন দর্শন। হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রূপেও পরিগণিত হয় শ্রীমদভগবদগীতা। ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সে হিন্দু ধর্মাবলম্বী সাংসদদের শপথ গ্রহণের জন্য দান করা হয়েছে এই পবিত্র গ্রন্থ। ব্রিটিশ সাংসদ শৈলেশ বরা হাউস অফ কমন্সের স্পিকার স্যার লিন্ডসে হোয়েলের হাতে তুলে দিয়েছেন শ্রীমদভগবদগীতা। শৈলেশ বরা জানিয়েছেন যে এই বছর ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনের পর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শ্রীমদভগবদগীতা ব্যবহৃত হবে বলে তিনি আশাবাদী। স্পিকার লিন্ডসে হোয়েল জানিয়েছেন যে ভারতের মায়াপুর মন্দির হতে তাঁর হাতে এই গ্রন্থ পৌঁছেছে। শ্রীমদভগবদগীতা গ্রহণ করে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন বলে জানান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রিটিশ সংসদের 'দ্য হাউস অফ কমন্স লাইব্রেরি'-তে নানা ধর্ম ও মতের বইপত্র রয়েছে যা সাংসদদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শ্রীমদভগবদগীতা হাতে নিয়েই ব্রিটিশ সাংসদ হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছিলেন ঋষি সুনাক যিনি ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন।

সুপ্রতিষ্ঠিত কথক শ্রীদেবকীনন্দন ঠাকুর হিন্দুদের জন্য দাবি করলেন সনাতন বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ২৬ মে ইন্দো-এশিয়ান নিউজ সার্ভিস (আইএএনএস) প্রকাশিত একটি ভিডিয়োতে প্রতিষ্ঠিত সংকীর্তনশিল্পী ও কথক শ্রীদেবকীনন্দন ঠাকুর মথুরায় শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি পুনরুদ্ধার এবং হিন্দুদের জন্য সনাতন বোর্ড দাবি করেছেন। তাঁর দাবি অনুযায়ী, হিন্দুদের জন্য তৈরি সনাতন বোর্ডকেও করে তুলতে হবে মুসলিমদের ওয়াকফ বোর্ডের সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁর এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি সংবলিত ভিডিয়োটি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে যেখানে সব মত ও পথের সমান অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত সেখানে ওয়াকফ বোর্ড ও সেই বোর্ডের মাধ্যমে মুসলিমদের এই বিশেষ ক্ষমতাভোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন তিনি।

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি মন্দির নির্মাণে অগ্রাধিকার দানের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তিনি অনুরোধ জানান। লোকসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রে বিজেপি পুনরায় ক্ষমতাসীন হলে হিন্দুদের জন্য একটি 'সনাতন বোর্ড' গঠনের দাবিটিও তিনি তুলে ধরেন। ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি বলেন যে স্বাধীনতার পর ভারত বিভাজন করে মুসলিমরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামক দুইটি দেশ নিজেদের জন্য দখল করেছে। কিন্তু এই পৃথিবীতে হিন্দুদের নিজেদের কোনো দেশ নেই। তবে ভারতের মধ্যে ওয়াকফ বোর্ড গঠন করে মুসলিমদের এই বিশেষ ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্য কী?

হিন্দু মন্দিরগুলির ওপরে সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং মুসলিমদের হজযাত্রায় ভর্তুকি ও সরকারি সাহায্যের জন্য হিন্দু মন্দিরগুলির প্রাপ্ত দান ও তহবিলের অপব্যবহার নিয়েও নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে একশো কোটি হিন্দুর এই দেশের ওপর প্রথম ও প্রধান অধিকার বলেও তিনি ঘোষণা করেন। ওয়াকফ বোর্ড বিলুপ্ত না হলে 'হিন্দু সনাতন বোর্ড'-এর দাবিতে দেশজুড়ে জনসচেতনতা অভিযানে বেরোনোর ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওয়াকফ বোর্ডকে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা অনুযায়ী তারা যে কোনো জমি বা বিষয়-সম্পত্তিকে ওয়াকফ বলে ঘোষণা করতে পারে। কারুর জমি তারা এই প্রক্রিয়ায় হস্তগত করলে, ওয়াকফ আইন অনুযায়ী এই বিরোধ বা ঝামেলা মেটাতে তাকে বা তাদেরকে সেই জমি লুটেরা ওয়াকফ বোর্ডেরই শরণাপন্ন হতে হবে। এই আইন অনুযায়ী দেশের অন্য কোনো আদালত ওয়াকফ সংক্রান্ত কোনো মামলা শুনবে না। পশ্চিমবঙ্গের একজন মৌলভি একটি ভিডিয়োয় সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক সদর দপ্তর নবান্ন, ইডেন গার্ডেন্স, আলিপুর আবহাওয়া অফিস, মোহন বাগান ও ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের ময়দান, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পুরো এলাকা ও অন্যান্য বহু স্থানকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে দাবি করেছে। এমনকী, ভারতকে এই ভিডিয়োয় ইসলামিক সম্পত্তি বলেও সে আখ্যা দেয়।

পুকুরে খোঁড়াখুঁড়ি করতেই উঠে এলো দেবমূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংস্কারের জন্য শুরু হয়েছিল পুকুর খননের কাজ। আর সেই খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করতে গিয়েই চাঞ্চল্য ছড়ালো বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের রাজশোল গ্রামে। কারণ, পুকুর খননের সময় উদ্ধার হয় পাথরের একটি প্রাচীন দেবমূর্তি। প্রত্ন গবেষকদের দাবি, মূর্তিটি কমপক্ষে হাজার বছরের পুরনো। বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের রাজশোল এলাকা একসময় ছিল মল্ল রাজাদের রাজত্বের অংশ। রাজশোল গ্রামের অদূরে থাকা প্রদ্যুম্নপুর গ্রাম দীর্ঘদিন ধরে ছিল মল্ল রাজাদের রাজধানী। সেই রাজশোলেই এর আগে একাধিক প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার হয়। গত ১৬ জুন প্রকাশিত একটি সংবাদ অনুযায়ী, এবার ওই

গ্রামেরই ফুলবাঁধ খননের সময় উদ্ধার হলো আরও একটি পাথরের মূর্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে যে সম্প্রতি ফুলবাঁধ নামের ওই পুকুরটি মজে যায়। মজে যাওয়া ওই পুকুরটি খনন করে সংস্কারের কাজ শুরু হয় সম্প্রতি। পে লোডার দিয়ে পুকুরের মাটি কেটে ফেলা শুরু হয়। এরপরই পে লোডারে মাটির সঙ্গে উঠে আসে পাথরের মূর্তিটি। মূর্তিটি কোন দেব বা দেবীর তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রত্ন গবেষকদের ধারণা উদ্ধার হওয়া মূর্তিটি আসল মূর্তির পার্শ্ব মূর্তি হয়ে থাকতে পারে। মূর্তিটি নবম ও দশম শতকে নির্মিত বলে মনে করছেন প্রত্ন গবেষকরা। কার্তিক পাল নামের একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন— 'আমি রাস্তায় বেরিয়ে যেতে দেখলাম পাঁকের সঙ্গে কিছু জড়িয়েছে। সেটা পরিষ্কার করতেই দেখা গেল একের পর এক মূর্তি বেরিয়ে আসছে। তবে বিষ্ণু না লক্ষ্মীনারায়ণ, না মনসা বুঝতে পারছি না'।

সেনাপ্রধান পদে লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর নাম ঘোষণায় অভিনন্দন জানালেন সরস্বতী বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রামপ্রসাদ চন্দ্রভান সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীদের সংগঠন— সরস্বতী বিদ্যামন্দির পূর্ব ছাত্র পরিষদের সংযোজক প্রবীণ কুমার সোনু সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে ভারতের পরবর্তী সেনাপ্রধান হিসেবে ভারত সরকার লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীকে নিযুক্ত করার পর সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে গোটা দেশের কাছে এটি একটি গৌরবজনক মুহূর্ত। তিনি জানান যে উপেন্দ্র দ্বিবেদী ছত্তিশগড়ের অম্বিকাপুরের সরস্বতী শিশুমন্দিরের ছাত্র ছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিগত চার দশকের দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে অনেক অপারেশনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শিশুমন্দিরের প্রাক্তন ছাত্রের দক্ষ নেতৃত্বে ভারতীয় সেনা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রবীণ।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী সেনাপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন পূর্ব ছাত্র পরিষদের সহ-সংযোজক আলোক কুমার আগরওয়াল, পরিষদের সক্রিয় সদস্য বিশাল জয়সোয়াল, আনন্দ বরেলিয়া, আনন্দ কুশওয়াহা, প্রবীণ দাঙ্গি, শুভম কুমার, রাজীব কুমার, গীতা মেহতা, অনিকা কুমারী, মহিমা সিংহ, শ্রেয়া কুমারী, অঙ্কুর আগরওয়াল, দীনেশ কুমার, প্যারে মোহন, অজয় আগরওয়াল, প্রিন্স আগরওয়াল, শ্রবণ কুমার ও শ্রীধর সিংহ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আগামী ৩০ জুন সেনাপ্রধান পদে কার্যভার গ্রহণ করবেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। ওই দিন অবসর গ্রহণ করতে চলেছেন ভারতের বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে। ১৯৬৪ সালের ১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন উপেন্দ্র দ্বিবেদী। ১৯৮৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনার ইনফ্যান্ট্রি (জম্মু-কাশ্মীর রাইফেলস্)-তে তিনি যোগদান করেন। গত ৪০ বছর দীর্ঘ কর্মজীবনে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। উপ-সেনাপ্রধান পদে নিযুক্ত হওয়ার আগে ২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত তিনি ইনফ্যান্ট্রি বা পদাতিক বাহিনীর মহানির্দেশক এবং সেনাবাহিনীর নর্দার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি)-র মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। মধ্যপ্রদেশের রেওয়ার সৈনিক স্কুল, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ও আমেরিকার আর্মি ওয়ার কলেজের প্রাক্তন ছাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ডিফেন্স ম্যানেজমেন্ট (প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা) বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রি লাভ করেছেন। স্ট্র্যাটেজিক অ্যাফেয়ার্স (রণনীতি সংক্রান্ত বিষয়) ও সৈন্য বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে তিনি দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রির অধিকারী। কর্মজীবনে দক্ষতা, সাহসিকতা ও একনিষ্ঠ সেবার জন্য তিনি পেয়েছেন একাধিক পদক ও সেনা সম্মান। পরম বিশিষ্ট সেবা মেডেল, অতি বিশিষ্ট সেবা মেডেল, তিন বার জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ পদে থাকার সূত্রে পুরস্কারস্বরূপ একটি বিশেষ কার্ডে অলংকৃত হয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী।

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে বড়ো দুর্ঘটনা, মৃত ১৫

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত বছর ওড়িশার বাহানাগায় করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার স্মৃতি উসকে দিয়ে গত ১৭ জুন উত্তরবঙ্গের ফাঁসিদেওয়ার রাঙাপানিতে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল। ওই দিন সকালে ধীরগতিতে চলতে থাকা ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারে ঘণ্টায় ৮০-৯০ কিলোমিটার গতিতে চলা একটি মালগাড়ি। তাতে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে দাবি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রেলের তরফে হতাহতের সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৬০ জন আহত হয়েছেন। হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা সংকটজনক। মৃতদের মধ্যে মাত্র সাত জনের পরিচয় জানা গিয়েছে। এই ঘটনার পরই রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। রেলের পক্ষ থেকে দুর্ঘটনায় প্রত্যেক মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। গুরুতর আহতদের আড়াই লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়। দফায় দফায় ঘটনার আপডেট নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন রাষ্ট্রপতি। এই দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে রয়েছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পার্সেল ভ্যানে থাকা— শঙ্করমোহন দাস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের গার্ড আশিস দে, মালগাড়ির চালক অনিল কুমার, রেলকর্মী বিশাল মিশ্র। মৃত যাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন আবগারি দপ্তরের কর্মী গালিসো সুব্বা, গুসকরার গৃহবধূ বিউটি বেগম, কলকাতার শুভজিৎ মালি। এই খবর লেখা পর্যন্ত অসমের কেউ মারা গিয়েছেন কিনা তা জানা যায়নি। এদিন সকাল ৮.৪০ মিনিটে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (১৩১৭৪)। নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে রাঙাপানির নিজবাড়ি এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছনে মালগাড়িটি সজোরে এসে ধাক্কা মারে। ইঞ্জিনের উপর উঠে যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের একটি বগি। এক্সপ্রেসের পিছন দিকের তিনটি কামরা লাইনচ্যুত হয়। কামরাগুলি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর শুধুই আর্তনাদ আর হাহাকারের শব্দ। ঘটনার পর উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় স্বয়ংসেবক ও মানুষজন। খবর পেয়ে দ্রুত দুর্ঘনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও উদ্ধারকারীরা। জরুরি ভিত্তিতে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। তবে দুর্ঘনার সময় মুষলধারে বৃষ্টি চলায় মাঝেমধ্যেই ব্যাহত হয় উদ্ধারকাজ। যে লাইনে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির সঙ্গে রেল যোগাযোগের প্রধান লাইন। ফলে দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। কামরার মধ্যে আটকে থাকা যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য নিয়ে আসা হয় গ্যাস কাটার। সাদা কাপড়ে মুড়ে একের পর এক রক্তাক্ত দেহ দুর্ঘটনাগ্রস্ত কামরা থেকে বের করে আনেন উদ্ধারকারীরা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে এই দিন সকালে নির্ধারিত সময়েই রওনা দিয়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। এরপর দ্রুতগতিতে চলা মালগাড়ি সেটিকে ধাক্কা মারার পর সংঘর্ষের তীব্রতায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছনের একটি বগি মালগাড়ির উপর উঠে যায় এবং তিনটিকামরা লাইনচ্যুত হয়ে পাশে ছিটকে পড়ে। খবর পাওয়া মাত্রই দার্জিলিঙের জেলাশাসক, এসপি ও চিকিৎসকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে এনডিআরএফের টিম নিয়ে আসা হয় উদ্ধারকাজের জন্য। পাশাপাশি এনবিএসটিসি-র ১০টি বাস যাত্রীদের নিতে ঘটনাস্থলে যায়। আহতদের উদ্ধারে ৫০টির বেশি অ্যাম্বুল্যান্স পাঠানো হয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলে উদ্ধারকাজ। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের পাশাপাশি দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছান রাজ্যপাল ড. সিভি আনন্দ বোস, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার এবং দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্তা।

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে ‘হিউম্যান এরর’-ই দায়ী বলে মনে করছে রেল। অর্থাৎ, রেলের জাবি, মালগাড়ি চালকের ভুলেই ঘটেছে এত বড়ো দুর্ঘটনা। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও জয়া ভার্মা সিনহা জানান— মালগাড়ির চালক সম্ভবত সিগনাল মানেননি বলেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদিও তদন্ত রিপোর্ট হাতে আসার পর পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রশ্ন উঠেছে, মালগাড়ির চালক কি ক্লান্তির কারণে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? তবে চালক একা ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সহকারী চালকও। সেক্ষেত্রে দু’জনেই ক্লান্তির কারণে ঘুমিয়ে পড়বেন, সেটা কি আদৌ সম্ভব? চলছে জল্পনা। তাই তদন্ত রিপোর্ট সামনে আসার পরই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এই দিন দুপুরে সাংবাদিক বৈঠকে জয়া ভার্মা সিনহা বলেন— ‘প্রাথমিকভাবে যা জানা যাচ্ছে, সেই অনুযায়ী লাইনে সিগনাল ঠিক ছিল। কিন্তু চালক সম্ভবত সিগনাল মানেননি। তবে পুরো বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষ। আপাতত দ্রুত উদ্ধার কাজ চালানো এবং ওই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করাই রেলের প্রধান লক্ষ্য। এরপর এই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হবে’। এইদিন সকালে অল্পের জন্য দুর্ঘটনা এড়ায় পদাতিক এক্সপ্রেস। জানা গিয়েছে, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘনার সময় সেই ঘটনাস্থল থেকে মাত্র আড়াই কিলোমিটার দূরে ছিল পদাতিক এক্সপ্রেস। দুর্ঘনার খবর পাওয়ার পরই থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই এক্সপ্রেসকে। □

‘পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর হলো বিদেশের জায়গা’, স্বীকার করে নিল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর আদতে বিদেশের জায়গা। কবি ও সাংবাদিক আহমেদ ফারহাজ শাহের গ্রেফতারির প্রসঙ্গে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে এই সত্য স্বীকার করে নিল পাকিস্তান সরকার। অভিযোগ উঠেছিল যে তাঁকে পাকিস্তান সরকার গুম করে দিয়েছে। পরে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের পুলিশের হেফাজতে তাঁকে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টে পাক-প্রশাসনের তরফে মন্তব্য করা হয়েছে, তাতে পাকিস্তানে অন্দরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর যখন বিদেশের জায়গা, তখন সেখানে কেন রেঞ্জার্স (পাকিস্তানি সেনা) পাঠানো হতো? বিষয়টি নিয়ে আপাতত ভারতের তরফে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

সংবাদসংস্থা সূত্রের খবর, গত ১৪ মে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান ফারহাদ। তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে গত ১৫ মে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন তাঁর স্ত্রী উরুজ জয়নাব।

গত ২৯ মে পাক অ্যাটর্নি জেনারেল মনসুর উসমা আওয়ান আদালতকে জানান যে ফারহাদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের পুলিশের হেফাজতে আছেন। পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে তাদের হেফাজতে আছেন ফারহাদ। ধীরকোট এলাকায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

গত ৩১ মে ফের সেই মামলার শুনানি হয়। ফারহাদের আইনজীবীর উপস্থিতিতে সেই মামলা শোনেন ইসলামাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি মহসিন আখতার কায়ানি। সেই সময় অ্যাডিশনাল অ্যাটর্নি জেনারেল তথা সরকার পক্ষের আইনজীবী মুনাওয়ার ইকবাল দাবি করেন যে ২ জুন পর্যন্ত হেফাজতে থাকবেন ফারহাদ। তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাঁর পরিবারের সদস্যদের। বেআইনিভাবে আটকে রাখার মামলা বন্ধ করে দেওয়ার আর্জি জানান পাকিস্তানের অ্যাডিশনাল অ্যাটর্নি জেনারেল।

যদিও ফারহাদের আইনজীবী পালটা জানান যে কবির সঙ্গে দেখা করতে ধীরকোট থানায় গিয়েছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু সেখানে তিনি ছিলেন না। পরে জানানো হয় যে তদন্তের জন্য তাঁকে মুজফ্ফরাবাদে নিয়ে আসা হয়েছে। সেই সওয়াল শোনার পরে পাকিস্তান সরকারের আর্জি খারিজ করে দেন বিচারপতি কায়ানি। তিনি জানান, যেদিন ফারহাদকে আদালতে পেশ করা হবে, সেদিন সেই মামলা খারিজ করা হবে।

এরই মধ্যে একাধিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের একটি থানার হেফাজতে আছেন ফারহাদ। তাঁকে ইসলামাবাদ হাইকোর্টের সামনে পেশ করা যাবে না। কারণ ওই এলাকাটি বিদেশি এলাকার মধ্যে পড়ে যা পাকিস্তানের হাতে নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর ও গিলগিট-বাল্টিস্তান আদতে ভারতের অংশ বলে বরাবরই স্পষ্টভাবে জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

টাকার বিনিময়ে অযোগ্যদের চাকরি, সিবিআইয়ের কাছে এজেন্টদের নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আগামী জুলাই মাসে সুপ্রিম কোর্টে অযোগ্য ও যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের তালিকা দিতে হবে রাজ্যকে। তার ঠিক আগেই আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের জেরা করে বড়ো তথ্য হাতে পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইতিমধ্যেই তারা প্রায় ২,৩০০ জন অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের জেরা করেছে। আর সেখানেই স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে যে এই রাজ্যে কীভাবে টাকার বিনিময়ে শিক্ষকতার চাকরি বিক্রি হয়েছে।

সূত্রের খবর, সিবিআইয়ের কাছে অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের জেরা করে একটি ভয়ঙ্কর তথ্য পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে— রাজ্য জুড়ে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জনের মতো লোক এই টাকা তোলার সঙ্গে যুক্ত। এই এজেন্টদের মধ্যে বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিও রয়েছে বলেও খবর। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে— বিরোধীরা এতদিন যে দাবি করছিল যে তৃণমূলের নেতারা এই চাকরি দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে অযোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষকতার চাকরি দিয়েছে, সেই দাবি কি সত্যি হতে চলেছে? কারণ টাকা তোলার ক্ষেত্রে প্রচুর এজেন্টদের যে নাম কেন্দ্রীয় সংস্থার কাছে এসেছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে আগামী মাসে সুপ্রিম কোর্টে যে শুনানি রয়েছে, সেখানে যদি এই এজেন্টদের তালিকা তুলে দেয় কেন্দ্রীয় সংস্থা, তাহলে সিঁদুরে মেঘ দেখতে হবে এই রাজ্যের সরকারকে। ঘুম উড়বে পশ্চিমবঙ্গের বহু প্রভাবশালীর। দিনের শেষে তেমনটাই বলছেন রাজনৈতিক সমালোচকরা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা